আদিবাসীদের বিচিত্র কথা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশবন্ধু বুক ডিপো
৮৪।এ-বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

মূল্য এক টাকা বার আনা মাত্র

আদিবাসীদের বিচিত্র কথা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

দেশবন্ধু বুক ডিপো
৮৪।এ-বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

মূল্য এক টাকা বার আনা মাত্র

প্রকাশক
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেশবন্ধু বুক ডিপো।
৮৪।এ-বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর--
শ্রীঅনাদিনাথ কুমার
উমাশঙ্কর প্রেস,
১২, গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

4160

ভূমিকা

আসাম ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের যে-সকল আদিবাসীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমার হয় তাদের কথা আমি ইতিপূর্ব্বে আমার 'বিচিত্র মণিপুর', 'আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী' প্রভৃতি পুস্তকে বলেছি। আদিবাসীদের কথা জানবার জন্যে দেশবাসীর ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ দেখে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আদিবাসীদের সম্বন্ধে বালক বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী একখানি পুস্তক রচনার সঙ্কল্প আমার মনে উদিত হয় এবং বৎসর দুই পূর্ব্বে এ কাজে হাত দিই। বন্ধুবর শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে পুস্তকখানি প্রকাশিত হল।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের বিদ্রোহ এবং তাদের মুক্তি-সংগ্রামের কাহিনীর সহিত শিক্ষিত দেশবাসীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই, বাংলাভাষায় এ সম্বন্ধে আলোচনাও বড় একটা হয় নি। আদিবাসীদের মুক্তি-সংগ্রাম সম্বন্ধে পাঠকদের যাতে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয় সেজন্যে প্রভূত পরিশ্রমে তথ্য সংগ্রহ করে এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেছি।

অন্ধ্রের কোণ্ডা ডোরা বিদ্রোহের নেতা শ্রীরামরাজা এবং ভীলজাতির মুক্তিসাধক মোতীলাল তেজাবৎ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বাংলা ভাষায় আলোচনা হয় নি। রাজপুতানার পিলানীনিবাসী শ্রীঅখিল বিনয় ভারতীয় আদিম জাতিসমূহ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। আসামের আদিম জাতি-সমূহ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য জানবার অভিপ্রায়ে তিনি পত্রযোগে আমার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করেন এবং 'হমারী আদিম জাতিয়াঁ' নামক হিন্দী ভাষায় লিখিত তাঁর পুস্তকখানি আমাকে পাঠিয়ে দেন। মোতীলাল তেজাবৎ সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধটি উক্ত পুস্তক অবলম্বনেই লিখিত।

অন্ধ্রদেশের 'শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভা' নামক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করবার উদ্দেশ্যে গত বৎসর আমি পশ্চিম গোদাবরী জেলার কব্বুর নামক স্থানে যাই। শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য

ভূমিকা

আসাম ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের যে-সকল আদিবাসীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ আমার হয় তাদের কথা আমি ইতিপূর্ব্বে আমার 'বিচিত্র মণিপুর', 'আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী' প্রভৃতি পুস্তকে বলেছি। আদিবাসীদের কথা জানবার জন্যে দেশবাসীর ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহ দেখে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আদিবাসীদের সম্বন্ধে বালক বৃদ্ধ সকল শ্রেণীর পাঠকের উপযোগী একখানি পুস্তক রচনার সঙ্কল্প আমার মনে উদিত হয় এবং বৎসর দুই পূর্ব্বে এ কাজে হাত দিই। বন্ধুবর শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে পুস্তকখানি প্রকাশিত হল।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের বিদ্রোহ এবং তাদের মুক্তি-সংগ্রামের কাহিনীর সহিত শিক্ষিত দেশবাসীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় নেই, বাংলাভাষায় এ সম্বন্ধে আলোচনাও বড় একটা হয় নি। আদিবাসীদের মুক্তি-সংগ্রাম সম্বন্ধে পাঠকদের যাতে একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয় সেজন্যে প্রভূত পরিশ্রমে তথ্য সংগ্রহ করে এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেছি।

অন্ধ্রের কোণ্ডা ডোরা বিদ্রোহের নেতা শ্রীরামরাজা এবং ভীলজাতির মুক্তিসাধক মোতীলাল তেজাবৎ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বাংলা ভাষায় আলোচনা হয় নি। রাজপুতানার পিলানীনিবাসী শ্রীঅখিল বিনয় ভারতীয় আদিম জাতিসমূহ সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। আসামের আদিম জাতি-সমূহ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য জানবার অভিপ্রায়ে তিনি পত্রযোগে আমার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করেন এবং 'হমারী আদিম জাতিয়াঁ' নামক হিন্দী ভাষায় লিখিত তাঁর পুস্তকখানি আমাকে পাঠিয়ে দেন। মোতীলাল তেজাবৎ সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধটি উক্ত পুস্তক অবলম্বনেই লিখিত।

অন্ধ্রদেশের 'শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভা' নামক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে একটি সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান করবার উদ্দেশ্যে গত বৎসর আমি পশ্চিম গোদাবরী জেলার কব্বুর নামক স্থানে যাই। শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য

সভার কর্ম্মকেন্দ্র 'বীর-মন্দিরে' সংরক্ষিত কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে আদিবাসীদের মুক্তিসংগ্রামের একটি অপ্রকাশিত অধ্যায় আমার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়। এই সমস্ত কাগজপত্র থেকে শ্রীরামরাজার নেতৃত্বে অন্ধ্রের কোণ্ডা ডোরা নামক আদিবাসীদের অভ্যুত্থানের আনুপূর্ব্বিক তথ্য আমি সংগ্রহ করি। এ বিষয়ে শ্রমিক ধর্ম্মরাজ্য সভার সম্পাদক, আমার অন্ধ্রদেশীয় বন্ধু শ্রী আর. মণ্ডেশ্বর শর্ম্মা আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন, শ্রীরাজরাজার ব্লকখানিও তিনি আমাকে ধার দেন। বীরমন্দিরের সমৃদ্ধ পুস্তকাগারে আর একটি বহুপ্রার্থিত জিনিষের সন্ধান পাই। সেটি নাগারাণী গাইডিলিউর সম্বন্ধে ইংরজী ভাষায় লেখা একখানি পুস্তিকা।

এই পুস্তকে আদিবাসীদের সম্বন্ধে কিছু অজানা তথ্য যে আমি পরিবেশন করতে পেরেছি সেজন্যে আমি বিশেষভাবে ঋণী শ্রীঅখিল বিনয়, আর শ্রীমণ্ডেশ্বর শর্ম্মা দু'জন বন্ধুর নিকট। তাঁদের ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

এই বইয়ের কোনো কোনো প্রবন্ধ শারদীয়া যুগান্তর, প্রবাসী. প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যুগান্তরের কর্তৃপক্ষ কতকগুলি ব্লক ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে উপকৃত করেছেন। পুস্তক প্রকাশে বন্ধুবর শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসুর নিকটও কিছু সাহায্য পেয়েছি।

আদিবাসীদের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্বন্ধে বহু তথ্য আজও অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছে। যদি তাদের অতীত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়, তাহলেই শ্রম সফল জ্ঞান করব।

৬-এ আশুতোষ শীল লেন।
কলিকাতা
২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আদিবাসীদের বিচিত্র কথা

ভারতীয় মহাজাতি ও আদিবাসী

অগণিত জনসমষ্টির বাসভূমি বিরাট উপমহাদেশ ভারতবর্ষ। এখানে কত জাতির মানুষ—কত বেশ-ভূষা, কত বিচিত্র তাদের আচার-ব্যবহার! কিন্তু এদেশে এই ভেদ-বৈষম্যের মধ্যেও একটা সুগভীর ঐক্য বিদ্যমান। সুদূর অতীতে ভারতের বুকে একদিন সুরু হয়েছিল ঐক্য-প্রতিষ্ঠার সাধনা ; কালক্রমে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ভেদ-বৈষম্য, বহুল পরিমাণে সেই সুমহান ঐক্যের আদর্শের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

ভারতের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতায় বলেছেন—

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা,
দুর্ব্বার স্রোতে এল কোথা হতে
সমুদ্রে হল হারা।

বস্তুতঃ, ভারতের ইতিহাস এই মহাসমন্বয়ের ইতিহাস, ভারতের সাধনা বহুধাবিভক্ত মানবগোষ্ঠীকে নিয়ে মহাজাতি

গঠনের সাধনা। বার বার সে আদর্শ ব্যাহত হয়েছে—কিন্তু ভারতের ভাগ্যবিধাতা সেই মহান লক্ষ্যের দিকেই ভারতবর্ষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

বর্ত্তমান ভারতরাষ্ট্রের জনসংখ্যা প্রায় বত্রিশ কোটি। এই বিপুল জনসমষ্টির শতকরা সাড়ে সাত জন হচ্ছে এদেশের আদিম অধিবাসী—ইদানীং যাদের বলা হয় আদিবাসী। আর্য্যদের আগমনের বহু পূর্ব্বে এরা ভারতবর্ষের গিরি-কান্তারে, সমতল ভূমিতে আর নদীতটে এসে বসতি স্থাপন করেছিল।

আর্য্যদের সঙ্গে সংগ্রামে পরাভূত হয়ে কালক্রমে এদের বহু লোক আর্য্যজাতির সমাজ-জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে 'এক দেহে লীন' হয়ে যায় এবং আর্য্য-অনার্য্য এই উভয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে ভারতীয় সভ্যতার বনিয়াদ গড়ে উঠে।

ভারতীয় সভ্যতার সেই উষাকালে অনেক অনার্য্যগোষ্ঠী নিজস্ব জাতীয় সত্তা একেবারে বিসর্জ্জন না দিয়ে আর্য্যদের প্রতিবেশীরূপে বাস করতে থাকে এবং হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা কতকটা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু এদের একটা বিরাট অংশ আর্য্য-সভ্যতার প্রভাব থেকে দূরে সরে গিয়ে অরণ্য-পর্ব্বতের নিভৃততম অঞ্চলে নিজেদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি অনুসরণ করে চলতে থাকে। সেজন্য আর্য্য ও প্রাগার্য্য এই দুই সংস্কৃতির মিলনে ভারতের বুকে যে নূতন সভ্যতা গড়ে উঠে তার প্রভাব থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত থেকে যায়। এই সমস্ত পর্ব্বত-অরণ্যচারী আদিবাসীরা আজও শিক্ষা সংস্কৃতি ও

বর্ত্তমান সভ্যতার পরিবেশ থেকে বহু দূরে সেই আদিম জীবনধারারই অনুবর্ত্তন করে চলেছে।

আশ্চর্য্য এই যে, একই দেশে পাশাপাশি প্রায় দু' হাজার বৎসর ধরে বাস করলেও আদিবাসীদের এক বিপুল জনসমষ্টিকে আমরা দূরে সরিয়ে রেখেছি। কি অপরিসীম অজ্ঞতা, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের মধ্যে যে এরা ডুবে আছে তা বলে শেষ করা যায় না। এদের অর্থনৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। কোনো কোনো আদিম জাতির লোকেদের বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস কেবলমাত্র বুনো ফলমূল খেয়েই জীবনধারণ করতে হয়। আধুনিক সভ্যতার সহিত এদের সম্পর্ক একপ্রকার নেই বললেই চলে। রাজপুতানার ভীলরা এই ধরণের এক শ্রেণীর আদিবাসী। তারা জঙ্গল পুড়িয়ে জুম-কৃষি-প্রথা পরিত্যাগ করেছে বটে, কিন্তু তাদের আদিম জীবনযাপন-প্রণালীর বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি। নিজেদের ক্ষেতের পাশে আলাদা আলাদা কুটীর নির্ম্মাণ করে তারা পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে, সেই জন্যে তাদের মধ্যে গোষ্ঠীপ্রীতি বা সঙ্ঘজীবন গড়ে উঠতে পারে না। মধ্যপ্রদেশের গন্দ অঞ্চলের মারিয়া এবং মুরিয়ারা পাহাড়ের উপরকার নিভৃত প্রদেশ থেকে কদাচিৎ নীচে নেমে আসে, কাজেই সমতলবাসীদের সঙ্গে তাদের বড় একটা মেলামেশার সুযোগ হয় না। উড়িষ্যার পার্ব্বত্য অঞ্চলের জুয়াং, ভুঁইয়া, খুটিয়া, খন্দ এবং লাঞ্জীয়া শবররা আজও শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন পুরোপুরি আদিম জীবন যাপন করছে এবং উড়িষ্যা

প্রদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর যে সকল আদিবাসী সমতলে বসবাস করে তাদের চেয়ে ঢের বেশী অনুন্নত অবস্থায় আছে। আসামের নাগা, লুসাই, গারো এবং মিকিররা বেশীর ভাগই পর্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করে এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে আসামের সহিত সম্পর্কিত হলেও সমতলের অসমীয়াদের সঙ্গে তাদের সংস্রব খুবই কম। সিংভূমের টাটানগর ষ্টেশনে নেমে, সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে শালবনে বেড়াতে গেলে দেখা যায়, মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে চলেছে একদল উলঙ্গপ্রায় বন্য পুরুষ—এরা হচ্ছে বীর-হড় নামক আদিম জাতির লোক। মাথায় তাদের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লম্বা চুল, হাতে পাথরের তৈরি কুঠার। এদের কোনো স্থায়ী বাড়ীঘর নেই, কুঁড়ে ঘর তৈরি করতে পর্য্যন্ত এরা জানে না। সারাদিন এরা বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার সময় বনের মধ্যে গাছের ডালপালা দিয়ে ঝুপড়ির মত তৈরি করে ভেতরে আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে রাত কাটায়।

ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্বপ্রান্তস্থ আসামের আদিবাসীরা আমাদের প্রতিবেশী হলেও এদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব সীমাবদ্ধ। আসামের অতীত ইতিহাস গৌরবময়। কত রাজা ও রাজবংশের উত্থান-পতন সেখানে হয়েছে, কত প্রাচীন রাজধানী, মন্দির, ভাস্কর্য্যশিল্প ইত্যাদির ভগ্নাবশেষ সারা আসামে ছড়িয়ে আছে! কিন্তু এসকল পুরাকীর্ত্তিই শুধু আসামের একমাত্র আকর্ষণ নয়, আদিবাসীদের কত যে বিচিত্র রূপ আসামে দেখতে পাওয়া যায় তার আর অন্ত নেই। আসামের

প্রায় পঁচিশ লক্ষ আদিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী।

আসামের আদিবাসীরা যে কিরূপে অনুন্নত অবস্থায় আছে সেকথা বুঝাবার জন্যে এখানে নাগাদের সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলব। নাগাদের জনসংখ্যা মোট সোয়া দুই লক্ষ। যে সমস্ত নাগা, নাগাপাহাড়ের রাজধানী কোহিমা প্রভৃতি স্থানে এবং আসামের সমতল অঞ্চলে বাস করে তারা কতকটা আধুনিক সভ্যতার আওতায় এসেছে, কিন্তু পাহাড়ের দুর্গম স্থানে যাদের বাস তাদের অবস্থা ভিন্নপ্রকার। পাহাড়ের দূরতম দুর্গম অঞ্চলের কোনো কোনো শ্রেণীর নাগারা এখনো অকারণে মানুষের মাথা কেটে আনাকে খুব একটা বাহাদুরি বলে মনে করে। রেঙ্গমা প্রভৃতি কোনো কোনো শ্রেণীর নাগাদের লজ্জাসরমের বালাই নেই। কোনো কোনো গ্রামের রেঙ্গমা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে চলাফেরা করে। তার উপর নাগারা একরকম সর্ব্বভুক বললেই চলে। সাপ, ব্যাঙ, কুকুর ইত্যাদি কোনো জীবজন্তুর মাংসই এরা বাদ দেয় না।

কিন্তু আদিবাসীদের আহারাদি সম্বন্ধে এ সকল কথা শুনে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করা অন্যায়। এরাও তো আমাদের মতই মানুষ। তা ছাড়া আসামের আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের জ্ঞাতিত্বের সূত্র আবিষ্কার করা কঠিন নয়। বাংলা আর আসাম এই দুটি প্রদেশে আর্য্যরক্তের সঙ্গে অষ্ট্রেলয়েড

আর মোঙ্গোল এই দুই শ্রেণীর অনার্য্য-রক্তের মিশ্রণ হয়েছে প্রচুর। বাংলা ও আসামের আর্য্য-সংস্কৃতি অনার্য্য-সংস্কৃতি থেকে অনেক সম্পদ আত্মসাৎ করে পুষ্ট হয়েছে। সুতরাং নিজেদের ভালো করে জানতে হলে আমাদের আদিবাসী জ্ঞাতি-ভ্রাতাদের সমাজ-জীবনের পরিচয় লাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের আদিবাসী ভ্রাতা-ভগিনীরা যে আজও এরূপ অনুন্নত অবস্থায় আছে তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী তো আমরাই। আমরাই তো এদের একটা বিরাট অংশের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা এতকাল এদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বেলে দেবার জন্যে চেষ্টা করি নি। শিক্ষার দিক দিয়ে এরা যে কতদূর পিছিয়ে আছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সারা ভারতের আদিম জাতিদের মধ্যে আসামের আদি-বাসীদের ভিতরেই শিক্ষাবিস্তার হয়েছে সব চেয়ে বেশী—তাও এদের মধ্যে শিক্ষিত শতকরা একজন মাত্র। এমতাবস্থায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীরা শিক্ষায় যে কত অনগ্রসর তা অনায়াসেই বুঝতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল আদিম জাতি বাস করে তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পূজাপার্ব্বণ ইত্যাদি বড়ই চিত্তাকর্ষক। ভারতের মাটির উপরে এদের দাবিই তো সর্ব্বাগ্রগণ্য। কেননা, এরাই এদেশে এসে প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। এদেশের মাটির সঙ্গে এদের নাড়ীর যোগ

সুগভীর। অতীতে এদের মধ্যে বহু দেশপ্রেমিক বীর সন্তানের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা নিজেদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা-রক্ষার জন্যে জীবন পণ করে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। আসামের কোচরাও আদিম জাতি। ষোড়শ শতাব্দীর কোচরাজা নরনারায়ণের ভাই শিলারায়ের সমকক্ষ বীর তাঁর সমকালে সারা উত্তরভারতে দ্বিতীয়টি ছিল না। ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধেও আদিবাসীরা বারবার রুখে দাঁড়িয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহের পর সাঁওতালবিদ্রোহই ভারতে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক সশস্ত্র বিদ্রোহ। মুণ্ডানেতা বীরসা ভগবান ভারতে প্রথম করবন্ধ আন্দোলনের প্রবর্তক। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নাগারাণী গুইদালোর অভ্যুত্থানের কাহিনী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আদিবাসীদের এই সমস্ত বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কাহিনী অবগত হবার জন্যে তেমন আগ্রহের সৃষ্টি আজও আমাদের হয় নি।

স্বাধীন ভারতে আজ আমাদের সব চেয়ে বড় আদর্শ মহাজাতি গঠনের আদর্শ। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ভারতের আড়াই কোটি আদিবাসীকে সমান অধিকার না দিলে সেই বিরাট আদর্শ ব্যাহত হবে। আজ তাই সেই সমস্ত আদি-বাসীদের নূতন আশার বাণী শুনাতে হবে, আমাদের উপেক্ষায় অথবা অন্যবিধ কারণে, যাদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। ভারতমাতার অভিষেকের জন্য প্রয়োজন

আজ জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়, উন্নত-অনুন্নত, আর্য্য-অনার্য্য নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর মিলিত প্রয়াস। নতুবা ভারতীয় মহাজাতি-গঠনের স্বপ্ন সফল ও সার্থক হয়ে উঠবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তাই আজ মহামিলনের মন্ত্র প্রচার করতে হবে ; উদাত্ত কণ্ঠে বলতে হবে :—

"এস হে আর্য্য এস অনার্য্য
হিন্দু মুসলমান,
এস এস আজ তুমি ইংরাজ
এস এস খ্রীষ্টান।
মার অভিষেকে এস এস ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র করা
তীর্থনীরে,
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে ॥"

ভারতের আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল

ভারতের আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যথা :—উত্তরপূর্ব্ব ভাগ, মধ্য ভাগ আর দক্ষিণ ভাগ। উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে প্রায় তিন লক্ষ আদিম জাতির লোক আছে—সিকিম এবং দার্জিলিঙের লেপ্‌চা থেকে আরম্ভ করে আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের কুকি লুসাই পর্য্যন্ত বহু জাতির লোক এই অঞ্চলের বাসিন্দা। আসামের সুবনশিরি নদীর পশ্চিম তীরে আকা দফলা মিরি এই কয়টি জাতির এবং ডিবং নদীর উভয় তীরে আবরগোষ্ঠীর বাস। ডিবং থেকে লোহিত নদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল মিশমিদের দ্বারা অধ্যুষিত। তা, ছাড়া আসামে রাভা মেচ কাছাড়ী মিকির গারো, খামতি; লোটা এবং সেমা প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর নাগা; মণিপুরী, কুকি, চিন, লুসাই, টিপরা ইত্যাদি বহু আদিম জাতির লোক বাস করে।

ভারতের মধ্যভাগে যে পর্ব্বতমালা আর্য্যাবর্ত্ত এবং দক্ষিণা-পথের মধ্যে সীমারেখা রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে সেগুলি স্মরণাতীতকাল থেকে বহু আদিম জাতির লোক দ্বারা অধিকৃত। এই ভাগে পড়ে, সমগ্র মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যগিরি পার্ব্বত্য অঞ্চল ও তৎসংলগ্ন সাতপুরা মহাদেব মহাকাল প্রভৃতি পর্ব্বত। এই পর্ব্বতশ্রেণীই বোম্বাইয়ের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের শেষ সীমানা পর্য্যন্ত চলে গেছে। নর্ম্মদা এবং গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী

বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক আদিম জাতীয় লোকের বাস। এই পর্ব্বতবেষ্টনীর পূর্ব্বভাগের বাসিন্দা প্রধান প্রধান উপজাতি হচ্ছে :—গঞ্জাম জেলার শবর, গাড়বা এবং বোন্দো ; উড়িষ্যার পাহাড়-অঞ্চলের জুয়াঙ্গ, খইরা, খন্দ ; সিংভূমের ও মানভূমের হো ভূমিজ ; ছোটনাগপুরের সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা। এই বেষ্টনীর মধ্য এবং পশ্চিম ভাগের প্রধান উপজাতি কোল, গন্দ এবং ভীল ; রেওয়া ষ্টেটের বইগা এবং বাস্টার ষ্টেটের মারিয়ারা এই ভাগের আর দুটি প্রধান উপজাতি।

কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ ভাগ ভারতের আর একটি প্রধান আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চল। এই অঞ্চলের প্রধান আদিবাসী নল্লাই-মল্লাই পাহাড়ের চেঞ্চু ; নীলগিরি পাহাড়ের টোডা বাডাগা এবং কোটা ; কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের পাহাড়িয়া অঞ্চলের মালকাদান এবং মাল কোরাবান।

নৃতত্ত্ববিদেরা ভারতের আদিম জাতির লোকেদের চেহারা, ভাষা, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা করে তাদের মূল তিনটি জাতিতে বিভক্ত করেছেন। যথা :—(১) নেগ্রিটো, (২) অষ্ট্রেলয়েড, (৩) মোঙ্গোলীয়। নেগ্রিটো বলতে মূল নিগ্রোবংশের লোকেদের, অষ্ট্রেলয়েড বলতে অষ্টেলিয়ার আদিম-অধিবাসীবৃন্দের স্বজাতিদের এবং মোঙ্গোলীয় বলতে সেই আদিম জাতির লোকেদের বুঝায় যাদের আদি বাসস্থান ছিল মোঙ্গোলীয়ায়।

অতিদূর অতীতে এই সকল বিভিন্ন জাতির এক এক দল লোক নিজেদের পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে নানা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরই প্রধান প্রধান কয়েকটি বংশের উত্তরপুরুষদের, আজকের দিনে ভারতের অরণ্য-পর্ব্বতে দেখতে পাওয়া যায়,—এরাই হচ্ছে ভারতের আদিবাসী।

ভারতের যে তিনটি বিভিন্ন বংশের আদিম মানবগোষ্ঠীর কথা বলা হ'ল তাদের মধ্যে নেগ্রিটোদের বাস দক্ষিণ ভাগে। যদিও এরা অনেকেই হিন্দুসমাজের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে তথাপি কোচিন এবং ত্রিবাঙ্কুরের কাডারদের মধ্যে নেগ্রিটোসুলভ লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। "স্প্রিংএর মত আঙটি" পাকানো মাথার চুল হচ্ছে নেগ্রিটো-বংশের লোকের একটি প্রধান লক্ষণ। এদের মধ্যে তার যথেষ্ট নমুনা মেলে। এরা হচ্ছে ভারতের একেবারে আদিমতম অধিবাসী, কৃষিকার্য্য ছিল এদের সম্পূর্ণ অজানা।

মধ্যভাগে যে সকল আদিম জাতির বাস তাদের চেহারায় নেগ্রিটো ছাপ পাওয়া যায় না, এরা হল অষ্ট্রেলয়েড বংশের। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতের অষ্ট্রেলয়েডদের চেহারায় একটা বিশেষ পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমোক্তদের ন্যায় ভারতের অষ্ট্রেলয়েডদের মুখ এবং শরীরে লোমের প্রাচুর্য্য নেই। এদের ভাষা অষ্ট্রিক বর্গের অন্তর্গত।

এই অষ্ট্রেলয়েডদের সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের। কৃষিই এদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন। এদের মধ্যে

সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত উন্নত তাদের দিহরি নামে একটি জেলা-পরিষদ আছে, তাতে সামাজিক অপরাধ ইত্যাদির বিচার হয়।

এদের সমাজ-জীবনের একটা লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল ধুমকারিয়া বা অবিবাহিত যুবক-যুবতীদের আলাদা যৌথ শয়নাগারের ব্যবস্থা। এদের লোকনৃত্য এবং সঙ্গীত উপভোগ্য। এদের মধ্যে গীতিকবিতা এবং গানেরও বিকাশ হয়েছে। নানা উপলক্ষে হিন্দুদের সঙ্গে মেলামেশা এদেরই হয়েছে সবচেয়ে বেশী এবং সেজন্যে এদের সমাজে হিন্দুধর্ম্ম ও আচার-অনুষ্ঠানাদির প্রভাব যথেষ্ট। এদের ভাষা হচ্ছে অষ্ট্রিক ভাষা।

ভারতের পূর্ব্ব অঞ্চলের আদিবাসীদের চেহারায় মোঙ্গোলয়েড ছাপ পরিলক্ষিত হয়—এরা মোঙ্গোলীয় মহাজাতির অন্তর্গত।

পূর্ব্বভারতের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের মধ্যে দু'টি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। (১) মৃতের উদ্দেশ্যে পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ, আর (২) সমাজে নারীর উচ্চ স্থান এবং মাতৃপ্রাধান্য প্রথার বিদ্যমানতা। রাভা, মিকির এবং কাছাড়ীদের মধ্যেও যে এক সময় এই প্রথার বিশেষ প্রভাব ছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়। খাসিয়া এবং গারোদের সমাজ-জীবন এখনো মাতৃপ্রাধান্য প্রথা দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবান্বিত। এই প্রথা অনুসারে সম্পত্তির মালিক পুরুষ হয় না, হয় স্ত্রীলোক এবং বংশের পরিচয় দিতে হয় পিতার নামে নয়, মাতার নামে।

আসামের পূর্ব্বপ্রান্তে ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের নাগাদের জীবনধারা এবং সংস্কৃতি কিন্তু আলাদা ধরণের। পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত এদের গ্রামগুলি সূক্ষ্মাগ্র বাঁশের বেড়া অথবা পাথরের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। কিছুকাল আগেও এদের মধ্যে নরমুণ্ড-শিকারের প্রথা ছিল। শাসন-সংস্কারের বাইরে যে সকল অঞ্চল রয়ে গেছে তন্মধ্যে কোনো কোনোটিতে এখনো এই প্রথা বিদ্যমান। উত্তর-আসামের কোনো আদিম জাতির মধ্যে কিন্তু কোনোকালে এই প্রথা ছিল বলে শুনা যায় না।

মধ্যভারতের আদিবাসীদের ন্যায় নাগাদের সমাজেও অবিবাহিত যুবকযুবতীদের জন্যে আলাদা যৌথ শয়নাগারের ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের শয়নাগারের নাম মোরাং আর মেয়েদের শয়নাগারের নাম মাসেং। মোরাংগুলিকে বলা যেতে পারে যুবসঙ্ঘ। সারা গাঁয়ের যুবকেরা এখানে সঙ্ঘজীবন কিভাবে গঠন ও পরিচালনা করতে হয় সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করে।

এই তিনটি ভাগে যে সকল আদিবাসী ও উপজাতি বাস করে তাদের সংখ্যা প্রায় ১৭৬টি, তন্মধ্যে আসামে ১৮টি ও বাংলাদেশে ২৯টি উপজাতির বাস। আসাম ভারতরাষ্ট্রের পূর্ব্বদিকের সীমান্তপ্রদেশ বলে এখানকার আদিবাসীদের সমস্যা খুবই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ।

—০—

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়েকটি বিশিষ্ট আদিবাসীর কথা

বিহার

ভারতের সবগুলি প্রদেশের মধ্যে বিহারেই আদিবাসীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বিহারে প্রায় ৪৩টি বিভিন্ন শ্রেণীর আদিম জাতি আছে। এই প্রদেশের রাঁচি, হাজারিবাগ, পালামৌ, মানভূম, সিংভূম, এবং সাঁওতাল পরগণায় প্রধানতঃ আদিম জাতির লোকেদের বাস। রাঁচি জেলার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা আশী জনই আদিবাসী। বিহারের আদিম জাতি-সমূহের মধ্যে সাঁওতালরাই প্রধান।

ভারতবর্ষে যে কয়টি প্রধান সংখ্যাগুরু আদিম জাতি আছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান—সাঁওতাল, গন্দ ও ভীল। ১৯৪১-এর আদমসুমারি অনুসারে, গন্দদের লোকসংখ্যা ৩২ লক্ষ, সাঁওতালদের ২৭½ লক্ষ এবং ভীলদের ২২½ লক্ষ।

সাঁওতাল—বিহারের সাঁওতাল পরগণায় সাঁওতালদের সংখ্যাধিক্য। এই প্রদেশের কয়লার খনিগুলিতে অনেক সাঁওতাল মজুর কাজ করে। সিংভূম জেলার জামশেদপুরের টাটার কারখানায় বহু সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে। কর্ম্মক্লান্ত দিনের শেষে সাঁওতাল-রমণীরা যখন পরস্পরের গলা-জড়াজড়ি করে গান গাইতে গাইতে বাড়ী

ফেরে তখন তাদের দেখলে মনে হয় তারা যেন আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। বনজঙ্গল কেটে নূতন বসতি স্থাপনে সাঁওতালদের জুড়ি নেই।

ওরাওঁ—এরা ছোটনাগপুরের একটি প্রধান আদিম জাতি। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিশনারীরা ওরাওঁদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার স্থরু করেন। বর্ত্তমানে এদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা তিন লক্ষেরও অধিক। খ্রীষ্টান ওরাওঁদের মধ্যে কয়েক জন বেশ শিক্ষিত।

মুণ্ডা, হো এবং ভূমিজ এই তিনটি হচ্ছে বিহারের অন্যান্য প্রধান আদিম জাতি।

উড়িষ্যা

উড়িষ্যার আদিবাসীদের মধ্যে খন্দ, পরজা এবং শবর এই তিনটি প্রধান।

খন্দ—এরা উড়িষ্যার একটি প্রধান আদিম জাতি। এদের লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ, আগেকার দিনে এদের মধ্যে নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, অদৃশ্য দেবতাকে এভাবে নরবলি দ্বারা প্রীত করা যায় এবং সেই মহাশক্তিমান দেবতা প্রতিদানে প্রচুর শস্য দিয়ে থাকেন। ব্রিটিশ শাসকবর্গ গত শতাব্দীর মাঝামাঝি এই কুপ্রথা নিবারণ করতে সক্ষম হয়েছেন। খন্দরা এখন দেবতার কাছে মানুষের পরিবর্ত্তে মোষ বলি দিয়ে থাকে।

পরজা—পরজা স্ত্রী-পুরুষের লজ্জা-নিবারণের ব্যবস্থাটি একেবারে আদিম। মেয়েদের পরিধেয় যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত। তারা দু'ফুট লম্বা আর আট ইঞ্চি চওড়া একটি ছোট কাপড়ের টুকরো কোমরে গেরো দিয়ে পরে। গলায় কারো কারো রকমারি পাথরে তৈরি মালা। তারা মাথা ক্ষুর দিয়ে চেঁচে কামিয়ে ফেলে।

পরজারা প্রধানতঃ চাষবাস করে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তারা গরু মহিষ এবং ছাগল পোষে।

শবর—শবররা দক্ষিণ উড়িষ্যার অধিবাসী। প্রবাদ এই যে, রামায়ণে বর্ণিত শবরী ছিলেন এই শবর-জাতীয়া স্ত্রীলোক, দীর্ঘকাল প্রতীক্ষার পর তিনি রামচন্দ্রের দেখা পেয়েছিলেন। রামচন্দ্র তাঁর নিকট থেকে ফল গ্রহণ করে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করেন। শবররা মুখ্যতঃ কৃষিজীবী। এদের কৃষি উন্নত ধরণের।

মধ্য-প্রদেশ

গন্দ—ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসী গন্দদের মধ্যে ১৯ লক্ষই বাস করে মধ্য-প্রদেশে। প্রাচীন কালে কতকগুলি গন্দ রাজ্য ছিল। আজকের দিনেও গন্দ-প্রদেশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গন্দ সামন্ত-রাজাদের শাসনাধীনে আছে। পুরাকালের ন্যায় এখনো গন্দদের অধ্যুষিত অঞ্চল গন্দওয়ানা নামে পরিচিত। গন্দ রাণী

দুর্গাবতী আকবরের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। মধ্য-প্রদেশের বাস্টার নামক ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে মারিয়া মুরিয়া গন্দ এবং হালবা নামে যে তিনটি জাতি বাস করে, নৃতত্ত্ববিদগণ মনে করেন, তারা পৃথিবীর প্রাচীনতম আদিম জাতিদের বংশধর। ভেরিয়ার এলউইন এদের মধ্যে বাস করে প্রচুর নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন।

বইগা—বইগারা তাদের প্রতিবেশী গন্দদের চেয়ে অনেক অনগ্রসর। গ্রামাঞ্চলে বইগা এবং গন্দরা পৃথক পৃথক পাড়ায় বাস করে। বইগাদের বাড়ীগুলি অপেক্ষাকৃত অপরিচ্ছন্ন। তুকতাক এবং তন্ত্রমন্ত্রে এদের অগাধ বিশ্বাস। ভাতরাস, মুরিয়া প্রভৃতি মধ্য-প্রদেশের অন্যান্য আদিবাসী।

রাজস্থান

ভীল—ভীলরা ভারতের তিনটি সংখ্যাগুরু আদিম জাতির অন্যতম। বোম্বাই এবং রাজস্থান এ দুইটি রাজ্যে এদের সংখ্যাধিক্য। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দোহাদের ভীল সেবা-মণ্ডল পাঁচমহল এলাকার ভীলদের মধ্যে সেবাকার্য্য পরিচালনা করে আসছে। পশ্চিম-খান্দেশের ভীল সেবা-মণ্ডল মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হলেও, বিশেষ কর্ম্ম-তৎপরতার পরিচয় দিচ্ছে এবং ভীল বালক-বালিকাদের শিক্ষা-দান-কার্য্যে বিশেষ মনোযোগী হয়েছে।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গুলা মহারাজ নামে একজন সন্ন্যাসীকল্প ভীল পশ্চিম-খান্দেশের ভীলদের মধ্যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেন—এই আন্দোলন বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। হাজার হাজার ভীল মদ্যপান পরিত্যাগ করে এবং নিত্য স্নানে অভ্যস্ত হয়। সম্প্রতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকেও তাদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

রাজস্থানে মিনা, ডামারিয়া কঞ্জর প্রভৃতি আরো কতকগুলি আদিম জাতি বাস করে।

উপরোক্ত জাতিসমূহ ছাড়া অন্ধ্র, আসাম, বাংলা, মধ্য-ভারত, মহারাষ্ট্র, কেবল, তামিল নাদ, ত্রিবাঙ্কুর, বিন্ধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত আদিম জাতির লোক বাস করে তাদের সকলের কথা বলা বর্ত্তমান পুস্তকে সম্ভব নয়। আমরা আসাম বাংলা অন্ধ্র প্রভৃতি ভারতের কয়েকটি প্রদেশের আদিবাসীদের রীতি-নীতি সমাজ-ব্যবস্থা, প্রাচীন ইতিহাস ইত্যাদির কথা বর্ণনা করব। ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন আদিবাসীগোষ্ঠীর সশস্ত্র এবং নিরস্ত্র সংগ্রাম সম্বন্ধেও সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

আসামের আদিবাসী

খাসিয়া

নৃতত্ত্ববিদদের সিদ্ধান্ত এই যে অষ্ট্রেলয়েড জাতির মন খ্মের গোষ্ঠীর খাসিয়া এবং সাঁওতাল প্রভৃতির আদি বাসস্থান ছিল

উত্তর-ইন্দোচীনের নিকটবর্ত্তী কোনো অঞ্চলে। তখন ইন্দোনেশীয়া থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল অষ্ট্রিকভাষী নানা জাতির বাস।

এই অষ্ট্রিকভাষী আদিম জাতির লোকেরা এদেশে এসে বেশীর ভাগই বসতি স্থাপন করে মধ্য-ভারতে, আর খাসিয়ারা গিয়ে আসামে আড্ডা গাড়ে। খাসিয়ারা সাঁওতালদের জ্ঞাতি হলে কি হয়, বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর গুণে এদের পরস্পরের চেহারার মধ্যে এমন পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেছে যে, এদের উভয়কে আজ একই বংশের লোক বলে চিনবার উপায় নেই।

নৃতত্ত্ববিদেরা অনেক গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, খাসিয়া এবং সিণ্টেংরাই আসামের প্রাচীনতম অধিবাসী। এদের আগমনের পূর্ব্বে আসামে যে কোনো সমাজবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর বাস ছিল না সেকথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

খাসিয়ারাই প্রথমে পূর্ব্বভারতে জুম-কৃষির প্রবর্ত্তন করে। জুম-কৃষি হল পাহাড়ীদের নিজস্ব কৃষিপদ্ধতি: এরা পাহাড়ের উপরকার জঙ্গল পুড়িয়ে সাফ করে দা দিয়ে মাটি কুপিয়ে সব রকম তরি-তরকারীর বীজ একসঙ্গে বপন করে—এই কৃষি-পদ্ধতি এখনো খাসিয়াদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

খাসিয়ারা সেই সুদূর অতীত কালেই ধান্য উৎপাদন করতেও জানত।

কামরূপের কামাখ্যা হিন্দুদের একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। পুরাণে আছে—দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করলে পর শিব তার মৃতদেহ কাঁধে করে তাণ্ডবনৃত্য জুড়ে দিলেন। এদিকে বিষ্ণু দেখলেন, সৃষ্টি রসাতলে যাবার যোগাড়। তখন তিনি সুদর্শন-চক্রে সতীদেহ টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেললেন। সতীর দেহের ছিন্ন অংশসমূহ যে যে জায়গায় পড়েছিল সেগুলো পীঠস্থানরূপে বিখ্যাত হল। কামাখ্যা সেই একান্ন পীঠের অন্যতম।

কোনো কোনো পণ্ডিত কিন্তু অন্য কথা বলেন। তাঁদের মতে কামাখ্যা কথাটি একটি খাসিয়া শব্দের রূপান্তর। অষ্ট্রিকগোষ্ঠীর যে-সকল খাসিয়া অতীতে নিজেদের পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে আসামে এসেছিল তারা প্রথমে গৌহাটির নিকটবর্তী অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ব্রহ্মপুত্রের তীরে এদের অধ্যুষিত অঞ্চলে একটি উৎসমুখ দিয়ে লাল জল বার হত। খাসিয়ারা এই উৎসটির নামকরণ করে কা-মেই খা। কা-মেই কথাটার মানে 'মা' আর খা হচ্ছে 'জন্মদান করা' এই কা-মেই খা-ই নাকি পরবর্তী কালে কামাখ্যায় রূপান্তরিত হয়ে হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থে পরিণত হয়েছে।

অষ্ট্রিকদের পর আসামে আসে বডগোষ্ঠীর লোকেরা—তাদের কথা আমরা যথাসময়ে বলব। খুব সম্ভব এই বডদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হয়ে খাসিয়ারা ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ সমতল অঞ্চল ছেড়ে পিছু হঠতে হঠতে দক্ষিণ দিকে এগুতে থাকে এবং

অবশেষে যে-পাহাড়টিতে এসে বসতি স্থাপন করে সেইটিই কালক্রমে তাদের নামানুসারে খাসিয়া ও জৈন্তা পাহাড় নামে পরিচিত হয়। বর্ত্তমানে খাসিয়া পাহাড়ে খাসিয়ারা এবং জৈন্তা পাহাড়ে সিণ্টেং বা প্নাররা বাস করে। খাসিয়া জৈন্তা পাহাড়ের উত্তরে কামরূপ, পূর্ব্বে নওগাঁ ও কাছাড় জেলা, পশ্চিমে গারোপাহাড় আর দক্ষিণে শ্রীহট্ট জেলা।

খাসিয়াদের রীতিনীতি

খাসিয়াপাহাড় কমলালেবুর দেশ। যে সকল কমলালেবু সিলেটের কমলা বলে পরিচিত তাদের উৎপত্তিস্থান হচ্ছে খাসিয়াপাহাড়।

খাসিয়াপাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। পাহাড়, ঝরণা, জলপ্রপাত, পাইনবন দেশটিকে নিরুপম সৌন্দর্য্যে ভূষিত করে রেখেছে।

খাসিয়ারা প্রকৃতির সন্তান—খাসিয়া ছেলেরা সারাদিন পাহাড়-জঙ্গলে প্রকৃতির স্নেহক্রোড়ে থাকতেই ভালবাসে। খাসিয়া মেয়েরা রীতিমত সুন্দরী। পাহাড়ের উচ্চতম স্থানে যে-সকল পাহাড়ী মেয়ে বাস করে তাদের অনেকেরই গায়ের রং বেশ ফরসা।

খাসিয়ারা বেশ বুদ্ধিমান। পূর্ব্বভারতের সমুদয় আদিম জাতির মধ্যে খাসিয়াদের ভিতরেই শিক্ষাবিস্তার হয়েছে সবচেয়ে বেশী। এদের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম

উপাধিধারীও আছেন। শিলং প্রভৃতি স্থানের খাসিয়াদের মধ্যে বহু লোক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ও পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। কিন্তু পাহাড়ের দুর্গম অঞ্চলে যে-সকল খাসিয়া বাস করে তারা এখনো নিজেদের আদিম কুসংস্কারসমূহ আঁকড়ে ধরে আছে।

গোটা খাসিয়াপাহাড়টি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই সমস্ত রাজ্যের সামন্ত-রাজাদের বলা হয় সিম। প্রত্যেক রাজ্যে রাজকার্য্যের সহায়তার জন্যে কয়েকজন মন্ত্রী ইত্যাদি নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ বা দরবার আছে। মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না করে এবং দরবারের মত না নিয়ে রাজা কোনো গুরুতর রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করতে পারেন না।

ব্রিটিশ আমলে এই রাজ্যগুলি ছিল আসাম-প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থার বাইরে। স্বাধীন ভারতে এগুলিকে আসামের শাসনাধীনে আনা হয়েছে।

খাসিয়া এবং সিণ্টেংদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ঢের বেশী। এরা খুব পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু এবং সদা প্রফুল্লচিত্ত। খাসিয়াদের সমাজে স্ত্রীলোকের প্রভাব খুব বেশী। সুপ্রাচীন কালে সিণ্টেংদের দেশ জৈন্তাপাহাড়ের রাজধানী জৈন্তার সিংহাসনের অধিকারিণী হতেন রাণীরা। সমতলের লোকেরা এই দেশকে বলত নারীরাজ্য—মহাভারতে এই নারীরাজ্যের উল্লেখ আছে।

স্ত্রীলোকের সংখ্যাধিক্য এবং প্রভাবের জন্য স্মরণাতীত কাল থেকে এদের সমাজে মাতৃপ্রাধান্য প্রথা প্রচলিত। আমাদের

সমাজে বাপ মারা গেলে ছেলেরা তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, আমরা বংশের পরিচয় দিই বাপ-পিতামহের নামে। কিন্তু মাতৃপ্রধান সমাজের ব্যবস্থা হল আলাদা ধরণের। সেখানে সকল বিষয়েই স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়। সেই জন্য মাতৃপ্রধান সমাজে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় মেয়েরা, ছেলেদের ভাগ্যে কাণাকড়িটিও জোটে না।

যে-সকল সমাজে মাতৃপ্রাধান্য প্রথা প্রচলিত সেগুলিতে বংশের পরিচয় দেওয়া হয় মাতা বা মাতামহীর নামে। খাসিয়াদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে—"লং জাইড না কা কন্থেই"—অর্থাৎ, স্ত্রীলোক থেকেই কুলের সৃষ্টি হয়েছিল। এদের সমাজে মায়ের মৃত্যুর পর সম্পত্তির বৃহত্তম অংশ পায় সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা। অবশ্য অন্যান্য মেয়েরাও তার সম্পত্তির কিছু কিছু অংশ পেয়ে থাকে।

খাসিয়ারা উ থ্‌লেন নামক এক জাতীয় বিরাটকায় সর্পের অস্তিত্বে বিশ্বাসী—নররক্ত ছাড়া নাকি উ থ্‌লেনের তৃপ্তি হয় না। ২০।২৫ বছর আগেও উ থ্‌লেনকে খুশী রাখবার জন্যে এরা প্রায়ই নরবলি দিত। উ থ্‌লেন সম্বন্ধে খাসিয়াদের মধ্যে নিম্নলিখিত কাহিনীটি প্রচলিত আছে :—

আগেকার দিনে চেরাপুঞ্জীর নিকটে এক গুহায় বাস করত এক বিরাটকায় বিষধর। সে আশপাশের মানুষ এবং পশু সবরকম প্রাণীকেই গিলে খেতে লাগল। শেষে একদিন এক সাহসী খাসিয়া একপাল ছাগল নিয়ে গুহার নিকটে

গিয়ে হাজির হল, আর এক একটি করে সব কয়টি ছাগলকে উ থ্‌লেনের গুহার ভিতরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। নিত্য এই উপহার পেয়ে উ থ্‌লেন ঐ লোকটির উপর প্রসন্ন হয়ে উঠল। শেষে লোকটি গুহার নিকটে এসে সঙ্কেতসূচক শব্দ করলেই উ থ্‌লেন ভেতর থেকে প্রকাণ্ড হাঁ করত আর লোকটি তার মুখের মধ্যে কাটা মাংসখণ্ডসমূহ নিক্ষেপ করত। এমনি ভাবে কিছুদিন গেল। অবশেষে লোকটি একদিন একটি জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড সঙ্গে করে গুহার নিকটে এসে হাজির হল। রোজকার মত সঙ্কেতসূচক শব্দ শুনে উ থ্‌লেন যেই মুখ খুললে অমনি সে সেই লৌহপিণ্ডটি তার মুখের ভেতরে ফেলে দিলে। দারুণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে উ থ্‌লেন পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হল। খাসিয়ারা তখন তার দেহটি টুকরো করে কেটে ফেললে, কিন্তু একটি মাংসখণ্ড কেমন করে জানি, সকলের নজর এড়িয়ে একপ্রান্তে পড়ে রইল, আর তার থেকে জন্ম নিলে লক্ষ লক্ষ উ থ্‌লেন। তারা চেরা এবং তার পার্শ্ববর্ত্তী খাসিয়া-পুঞ্জীগুলিতে লোকেদের বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিলে। কিন্তু দেখা গেল উ থ্‌লেনরা যে-পরিবারে থাকে সে-পরিবারের কোনো অনিষ্ট করে না—বরং তাদের ধনসম্পদ আর শ্রীবৃদ্ধি হয়। শেষ পর্য্যন্ত গৃহস্থদের সঙ্গে তার একটি সর্ত্ত হল। সেটি হচ্ছে এই যে, সময় সময় নররক্ত দ্বারা তার তুষ্টিবিধান করতে হবে। পরিবারে যখন আধি-ব্যাধি দুঃখদারিদ্র্য দেখা দেয় তখনই খসিয়ারা মনে করে যে, উ থ্‌লেনের ক্রোধের

সঞ্চার হয়েছে। তখন পরিবারের কোনো লোক মানুষের রক্ত সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে রূপোর কাঁচি আর একটি বাঁশের চোঙ্ নিয়ে বের হয় এবং কোনো পথচারীকে নিভৃত স্থানে একলা পেলে তাকে বাগে এনে তার চুলের ডগা এবং হাতের নখ কেটে নেয় আর তার নাকে একটি ক্ষত করে দেয়। লোকটির নাকের ছিদ্র দিয়ে যখন রক্ত ঝরতে থাকে, আক্রমণ-কারী তখন বাঁশের চোঙাটি রক্ত দ্বারা ভরতি করে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে আসে এবং জোগাড় করে আনা চুল নখ আর রক্ত উ থ্‌লেনের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে। যার রক্ত নিয়ে আসা হয়, সে নাকি শক্ত অসুখে পড়ে এবং অচিরেই মারা যায়। এতে উ থ্‌লেনের ক্রোধের সাময়িক উপশম হয়, উ থ্‌লেন নাকি ইচ্ছা করলে সুতোর মত সরু হয়ে যেতে পারে। গৃহস্বামিনী তাকে একটা মাটির পাত্রে বন্ধ করে ঘরের মধ্যে রেখে দেয়। পূজার সময় গভীর রাত্রে ঢোলক বাজিয়ে উ থ্‌লেনকে বেরিয়ে আসবার জন্যে অনুনয়বিনয় করা হয়। সে তখন মৃৎপাত্র থেকে বেরিয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে বিরাট আকার ধারণ করে।

খাসিয়াদের বিশ্বাস এই বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, তাঁকে তারা বলে উ ব্লেই। অন্যান্য পাহাড়ীদের ন্যায় খাসিয়ারাও ভূতপ্রেতের পূজা করে। পুরোহিতকে এরা বলে লিংডো। পূজা উপলক্ষ্যে এরা পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশ্যে শূকর মোরগ ইত্যাদি বলি দেয়। খাসিয়াদের বিশ্বাস যাদের

সংকারক্রিয়া নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে তাদের আত্মা সুপারিগাছে ভরা ভগবানের বাগানে যায় এবং সেখানে গিয়ে মনের সুখে দিনরাত পানসুপারি খায়। মৃত ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠলে প্রায়ই খাসিয়াদের বলতে শুনা যায়—"উবা বাম কোয়াই হা ইং উব্লেই—(অর্থাৎ, 'সেই ব্যক্তি যে ভগবানের বাড়ীতে পান-সুপারি খাচ্ছে'।) খাসিয়াদের মতে অবাধে পান-সুপারি খাওয়ার মত সুখ আর কিছুই নেই। এরা যেখানেই যাক না কেন পান-সুপারিতে পূর্ণ ছোট একটি কাপড়ের থলে সঙ্গে থাকবেই। খাসিয়া-বাড়ীতে বেড়াতে গেলে বাড়ীর গৃহিণী পান-সুপারি দিয়ে সমাদরে অভ্যর্থনা করে।

সিণ্টেং

জৈন্তাপাহাড় হচ্ছে সিণ্টেংদের দেশ। মনোরম পাইনবনে ঘেরা জোয়াই জৈন্তাপাহাড়ের রাজধানী।

সিণ্টেংরা খাসিয়াদের নিকটতম জ্ঞাতি। এদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি ইত্যাদিও অনেকটা খাসিয়াদের অনুরূপ। তবে এমন কতকগুলি পূজাপার্ব্বণ আছে যা সম্পূর্ণ এদের নিজস্ব। বে ডিং খ্লাম হচ্ছে তার মধ্যে একটি। খাসিয়াদের সমাজে এই পরবের প্রচলন নেই। প্রতি বৎসর জুন মাসে জোয়াইয়ে এবং জৈন্তাপাহাড়ের আরো নানা স্থানে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বে ডিং খ্লাম কথাটার মানে লাঠি দিয়ে মহামারী তাড়ানো।

জোয়াই শহরের প্রত্যেক পল্লীতে এক একটি কা-ইং পূজা অর্থাৎ পূজাঘর আছে। জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে শহর এবং আশপাশের গ্রামসমূহের ছেলে বুড়ো সকলে 'কা-ইং-পূজা'গুলিতে সমবেত হয়ে কাজকর্ম্মে রত হয়। প্রথম কয়দিন তাদের কাজ রং-বেরঙের কাগজ দিয়ে রথ তৈরি করা। তারপর একদিন সকালে সবাই প্রচুর পরিমাণে মদ খেয়ে হাততালি দিয়ে উদ্দাম নৃত্য করতে করতে গোটা শহরখানা প্রদক্ষিণে রত হয়। নাচের তালে তালে তারা মুখ দিয়ে 'হয়' 'হয়' শব্দ করতে থাকে। সেদিন জঙ্গলের ভেতর থেকে কতকগুলি গাছ কেটে আনা হয় এবং গৃহস্থেরা নিজ নিজ বাড়ীর উঠানে এক একটি গাছ পুঁতে রাখে। সেদিন সিণ্টেং-বাড়ীতে গেলে দেখা যায়, পুরুষেরা এক একটি লাঠি দ্বারা ঘরের চালে আঘাত করতে করতে মহামারীর ভূতকে ঘর ছেড়ে চলে যাবার জন্যে অনুনয়বিনয় করছে।

বিকালবেলা সকলে কাগজের তৈরি সং বেলুন ইত্যাদি সহ এক খোলা ময়দানে জমায়েৎ হয়ে আবার নৃত্য আরম্ভ করে। মেয়েরা উত্তম বেশভূষা পরে নাচ দেখবার জন্যে দলে দলে সেখানে এসে উপস্থিত হয়।

নৃত্য শেষ হলে কাগজের তৈরি রথগুলিকে কা-ইং-পূজাসমূহ হতে বের করে এনে সহর থেকে কিছুদূরে একটি জলার নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে এক হাঁটু জলের মধ্যে সকলে আবার নৃত্য সুরু করে। জলার কাছে স্ত্রী-পুরুষের যেন মেলা জমে যায়।

জলমধ্যে কিছুক্ষণ নৃত্য হবার পর একদল লোক সদ্যকাটা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষকে বহন করে নিয়ে আসে। ঐ গাছটি উ-ব্লেই অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতীক। বৃক্ষটি জলে স্থাপিত করবার পর দলে দলে লোকেরা সেটিতে চড়ে বসে, তারপর সুরু হয় গাছটিকে দখল করবার জন্যে বিভিন্ন দলের মধ্যে লড়াই। সিণ্টেংদের বিশ্বাস যে-দল গাছটি দখল করতে পারবে, সেই দলের লোকেরা আগামী বৎসর স্বাস্থ্য এবং সমৃদ্ধি লাভ করবে।

সন্ধ্যার আগে কাগজের তৈরি রথসমূহ এবং বৃক্ষটিকে জলাতে বিসর্জ্জন দিয়ে যে যার ঘরে ফিরে আসে।

প্রাচীনকালে সিণ্টেং রাজারা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং স্বজাতিদের মধ্যে বহু হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। সেজন্যে এদের সমাজে হিন্দু-প্রভাবের বহু নিদর্শন আজও বিদ্যমান।

সিণ্টেং ও খাসিয়াদের অতীত ইতিহাস

শ্রীহট্ট জেলার জৈন্তাপুরে সিণ্টেং রাজাদের প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। সিণ্টেং রাজারা এবং রাজ-পরিবারের লোকেরা যে নিজস্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন সেকথা আগের অধ্যায়ে বলেছি। কালক্রমে তাঁদের রাজধানী জৈন্তাপুর তান্ত্রিকতার লীলানিকেতনে পরিণত

হয়। জৈন্তাপুরে সিণ্টেং রাজাদের প্রতিষ্ঠিত জয়ন্তেশ্বরীর মন্দিরের সামনে এখনো একটি শানবাঁধানো প্রকাণ্ড বেদী বিদ্যমান—সিণ্টেং রাজাদের আমলে এই স্থানে নরবলি দেওয়া হত। নারীরাজ্য জৈন্তাপুরের অধীশ্বরী বীরাঙ্গনা প্রমীলা অর্জ্জুনের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

সুপ্রাচীন কালে জৈন্তাপুরের সিংহাসনে বসতেন রাণীরা। শেষে এই প্রথার পরিবর্ত্তন হয় এবং রাজারাই রাজসিংহাসনের অধিকারী হন। কিভাবে নারীরাজ্যে পুরুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় সে কাহিনী চিত্তাকর্ষক।

তখনকার দিনে সমগ্র আসাম জুড়ে ছিল কামরূপের রাজাদের অখণ্ড প্রতাপ। পাহাড়ীদের সঙ্গে কামরূপের রাজাদের কি সম্পর্ক ছিল তা সঠিক করে বলা কঠিন। তবে যতদূর জানা যায়, পাহাড়ীরা বর্ম্মণ-রাজাদের প্রভুত্ব স্বীকার করলেও, সে ছিল নামে মাত্র পরাধীনতা এবং উভয় রাজ্যের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক বজায় রাখবার জন্যে জৈন্তায় কামরূপের একজন রাজদূত নিযুক্ত থাকতেন।

লোকমুখে প্রচলিত প্রবাদ থেকে জানা যায় যে, জৈন্তাপুরের শাসনকর্ত্রী কা উর্ম্মি রাণী কামরূপের রাজদূত সিন্ধু রায়কে বিয়ে করেন। কা উর্ব্বরা নামে তাঁদের একটি কন্যা-সন্তান জন্মে। কা উর্ব্বরা যথাসময়ে জৈন্তাপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও কামরূপের রাজদূত কৃষকের প্রতি আসক্ত

হয়ে তাঁকে বিয়ে করেন। কৃষক প্রচার করলেন যে, তিনি রাজা পরীক্ষিতের বংশধর, তাঁর শরীরে চন্দ্রবংশের রক্ত প্রবাহিত। সিণ্টেং-রাণীর গর্ভে তাঁর একটি ছেলে জন্মাল। এই ছেলেকে যাতে যথাসময়ে রাজসিংহাসনে বসানো যায়, কৃষক সেই স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তিনি রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করলেন এবং এই নিয়ম করলেন যে, এর পর থেকে রাণীর সকলের ছোট মেয়ের বদলে বড় ছেলে সিংহাসনে বসবে। চিরাচরিত প্রথার পরিবর্ত্তনে কামরূপের রাজা ভাবী বিপদের আশঙ্কা করে কৃষককে রাজদূতের পদ থেকে বরখাস্ত করলেন এবং তাঁকে কামরূপে ফিরে আসতে বাধ্য করলেন। কিন্তু ঘটনাচক্র এমনি ভাবে আবর্ত্তিত হল যে, কৃষকের পুত্র হাটক তাঁর মা কা উর্ব্বরার মৃত্যুর পর জৈন্তার সিংহাসনে বসলেন—নারীরাজ্যে এই প্রথম পুরুষের সিংহাসনারোহণ।

ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, কৃষক খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের লোক।

হাটক বিয়ে করেন কামরূপের এক রাজকন্যাকে, তাঁর পুত্র গুহক হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। গুহকের ছিল তিন পুত্র আর দুই কন্যা। বড় মেয়ে শেলাকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন। পাহাড়ের দক্ষিণদিকে ঢালু জায়গায় এক হ্রদে শেলা একদিন স্নান করতে গেছেন এমন সময় কতকগুলি দুর্ব্বৃত্ত এসে তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে



উৎসববেশে সজ্জিত নাগাদল কর্তৃক
আসামের ভূতপূর্ব্ব রাজ্যপাল শ্রীপ্রকাশের সংবর্দ্ধনা

যায়। তাঁর বাবা শেষে তাঁকে গুণ্ডাদের কবল থেকে উদ্ধার করেন। কিন্তু এই ব্যাপারে শেলা মনে এত বড় আঘাত পান যে, সংসারধর্ম্মে তাঁর আর মন বসল না, তিনি স্থির করলেন, পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে বাস করে ভগবানের নাম নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবেন। তাঁর বাবা এতে সম্মতিপ্রদান করলেন। যে-জায়গা থেকে এই রাজকন্যা অপহৃতা হন, তাঁর নামানুসারে সে স্থানের নামকরণ করা হয় শেলা এবং রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তে যেখানে ঈশ্বরের উপাসনা করে তিনি বাকী জীবন কাটান, তাঁর পিতার ইচ্ছায় সে জায়গার নাম হয় শেলাহাট।

কন্যার মৃত্যুর পর রাজা গুহক তাঁর তিন পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিয়ে সংসারত্যাগ করেন। শ্রীহট্টের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও তাঁর বিশাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুহক বড় ছেলে জয়ন্তকে পাহাড়িয়া অঞ্চল দিয়ে যান।

জয়ন্তের পুত্র জয়মল্ল ছিলেন মস্ত বড় বীর। তাঁর পরবর্ত্তী আমলের বাঞ্চারু নামে আর এক রাজার কথা জানতে পারা যায়। তিনি গাছপালা রোপণ করে রাজ্যের বন-সম্পদের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। তখনকার দিনে বনজ দ্রব্যের জন্যে জৈন্তারাজ্যের বিশেষ খ্যাতি ছিল। ভারতের নানা স্থান থেকে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ব্যবসায়ীরা তখন জৈন্তারাজ্যের অন্তর্গত শ্রীহট্ট বন্দরে এসে হাজির হত। তাদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতাও জৈন্তারাজ্যে এসে প্রবেশ করে। জৈন্ত্যারাজ

বাঞ্চারু এই বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতা দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং তিনি বামজঙ্ঘা কালী-মন্দিরে নরবলি-প্রথার প্রবর্ত্তন করেন।

এর পর থেকে জৈন্তারাজ্যে নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে থাকে, অবশেষে (১১২০-৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তীকালে) ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী কেদারেশ্বর রায় জোর করে সিংহাসন দখল করেন।

অতঃপর পাঁচ পুরুষ ধরে জৈন্তাপুরে চলে ব্রাহ্মণ-রাজাদের আধিপত্য। এঁদের আদি বাসস্থান ছিল সম্ভবতঃ কামরূপ বা পূর্ব্ববঙ্গে। এঁরা পাহাড়ীদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের অনেক আদর্শ ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করেন। এই সময় সমতল-বাসীদের সঙ্গে পাহাড়ীদের রক্তের মিশ্রণও হয় প্রচুর এবং একটা মিশ্র জাতি, আর আর্য্য অনার্য্য এই উভয় সংস্কৃতির মিলনের ফলে এক মিশ্র সংস্কৃতির উদ্ভব হয়।

জৈন্তার পাহাড়ী রাজা জয়ন্ত রায়ের একমাত্র কন্যা ছিলেন জয়ন্তী ; ব্রাহ্মণ-মন্ত্রী চণ্ডীবরের পুত্র লাণ্ডাবারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। স্বামীর মতিগতি ভালো নয় দেখে জয়ন্তী তাঁকে রাজপ্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজে রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। জয়ন্তীর বিতাড়িত স্বামী হুটুঙ্গা গ্রামে গিয়ে বাস করতে থাকেন। সেখানে এক খাসিয়া-রমণীকে তিনি বিয়ে করেন, এই খাসিয়ানীর গর্ভে তাঁর একটি পুত্রসন্তান জাত হয়। এই ছেলেটি বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পর খাসিয়া এবং সিন্টেংরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁকেই সিংহাসনে বসায়। বহুদিন পরে

এমন একজন জৈন্তার সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন যাঁর শরীরে মাতৃকুলের দিক থেকে একেবারে খাঁটি আদিম রক্ত বহমান। এঁর নাম বুড়া গোঁসাই। এঁর সময় থেকে নিয়ম হল যে, রাজার মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে নয়, কিন্তু তাঁর বোনের ছেলে সিংহাসনে বসবেন।

এ তো গেল জৈন্তারাজ্যের প্রধানতঃ পৌরাণিক ও জনশ্রুতিমূলক কাহিনী। এবার আমরা ভারতে মুসলমান-যুগের সমসাময়িক জৈন্তারাজ্যের কথা বলব।

তখন পূর্ব্ব-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দ্রুত পটপরিবর্ত্তন হচ্ছে। এদিকে মুসলমানেরা এসে শ্রীহট্ট দখল করেছে, ওদিকে প্রবল পরাক্রান্ত আহোমদের দাপটে প্রাচীন কামরূপ রাজ্য খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়বার উপক্রম। এই প্রচণ্ড বিপর্য্যয়ের মধ্যে জৈন্তা নিজের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিল, কিন্তু প্রায় দু'শ বছর কোন্ কোন্ রাজা সেখানে রাজত্ব করেছিলেন সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না।

খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতক থেকে জৈন্তারাজ্যের রীতিমত ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক পার্ব্বত্য নৃপতি জৈন্তাপুরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি পর্ব্বত রায় এই হিন্দু নাম গ্রহণ করেছিলেন, পর্ব্বত রায়ের রাজত্বকাল ১৫০০—১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। এর পর থেকে জৈন্তারাজ্যের প্রায় ২৩ পুরুষের লিপিবদ্ধ ধারাবাহিক ঐতিহাসিক

বিবরণ পাওয়া যায়। রাজারা এবং রাজ-পরিবারের প্রত্যেকেই ছিলেন হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী।

রাজা বড় গোঁসাঞ্রির (১৫৪৮—১৫৬৪) আমলে বামজঙ্ঘা পীঠের বিশেষ সংস্কার সাধিত হয়। তিনি জৈন্তাপুরের তিন মাইল দূরবর্ত্তী রূপনাথ গুহার নিকটে রূপনাথ শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা বিজয়মাণিকের আমলে (১৫৬৪—৮০) কোচরাজার সেনাপতি শিলারায় জৈন্তারাজ্য আক্রমণ করেন। লড়াইয়ে জৈন্তারাজ পরাজিত হন। পরবর্ত্তী রাজা ধনমাণিকের সঙ্গে কাছাড়ীদের বিবাদ বেধে ওঠে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিরুপায় হয়ে অসম্মানজনক সর্ত্তে জৈন্তারাজ কাছাড়ী-রাজার সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন। তাঁর পুত্র যশোমাণিক কিন্তু আহোমদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে কাছাড়ীদের রীতিমত জব্দ করেন।

রাম সিংহের রাজত্বকাল ১৬৯৪—১৭০৮ পর্য্যন্ত। তিনি ছিলেন দেব-দ্বিজে পরম ভক্তিমান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আহোম-সেনাপতির চক্রান্তে সপুত্র বন্দীকৃত হয়ে তিনি তেজপুরের নিকটবর্ত্তী বিশ্বনাথে আহোম-শিবিরে রাজা রুদ্রসিংহের নিকটে নীত হন। সেখানে বসন্তরোগে তাঁর মৃত্যু হয়। আহোম-রাজা তাঁর পুত্রকে এই সর্ত্তে মুক্তি দেন যে, তিনি তাঁর অধীনতা স্বীকার করে চলবেন।

এর পর কিছুকাল জৈন্তারাজ্যে বেশ শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিগুমান থাকে। রাজার উৎসাহ এবং আনুকূল্যে বাংলাদেশ

এবং অন্যান্য জায়গা থেকে শিক্ষিত ব্রাহ্মণেরা জৈন্তাপুরে এসে বসতিস্থাপন করেন। রাজার নিকট থেকে তাঁরা নিষ্কর ভূমি-লাভ করেন এবং শিক্ষাদান ও ধর্ম্মপ্রচারে তৎপর হন।

সিলেটে তখন মুসলমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সিলেট থেকে জৈন্তারাজ্যের সীমারেখা নয় মাইল মাত্র দূরে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দীর্ঘকাল মুসলমানেরা জৈন্তাপুরের এক ইঞ্চি জায়গাও দখল করবার চেষ্টা করে নি।

অবশেষে মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবৰ্দ্দী খাঁর মাথায় জৈন্তাপুরে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে একটা মতলব এল। সিলেটের শাসন-ভার আলীবর্দ্দীর হাতেই ন্যস্ত ছিল। তিনি স্থির করলেন যে, জৈন্তারাজ দ্বিতীয় বড় গোঁসাঞির বোন্‌কে বিয়ে করবেন। তা হলে এই রাণীর গর্ভে তাঁর যে ছেলে জন্মাবে সেই হবে জৈন্তার রাজ-সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী, কেননা জৈন্তারাজ্যের প্রথা এই যে, রাজার মৃত্যুর পরে তার বোনের ছেলেই রাজ্য পায়। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে জৈন্তারাজের ভগ্নী ভৈরবী কুঁয়রীর সঙ্গে আলীবৰ্দ্দী খাঁর পরিণয় হয়। এই বিবাহের বহুদিন পরে এঁর গর্ভে আলীবৰ্দ্দী খাঁর যে পুত্রসন্তানের জন্ম হল তাঁর নাম ফতে খাঁন। বড় হয়ে তিনি যখন জৈন্তাপুরে তাঁর মামার সিংহাসন দাবি করতে এলেন তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে জৈন্তাপুরের সিংহা-সনের আর এক দাবিদার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ফতে খাঁনের মামার আর এক বোনের ছেলে। সেই মাতৃষ্বসা

হয়ে গেছে—বাঙালী হিন্দু থেকে পৃথক করে তাদের গোত্র-পরিচয় আজ খুঁজে বার করা একরকম অসম্ভব বললেই চলে।

কাজেই বাংলার আদিবাসী বলতে ইদানীং সেই সকল বহিরাগত আদিম জাতির লোকেদের বুঝায় যারা নিজস্ব আচার-ব্যবহার নিয়ে হিন্দুসমাজ থেকে পৃথক হয়ে বাংলাদেশে বাস করছে। বাংলাদেশ দু'ভাগে বিভক্ত হওয়ায় বহু আদিবাসী এখন পূর্ব্বপাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসী হয়ে পড়েছে। বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী ও উপজাতীয় লোকেদের সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ লক্ষ, আর পূর্ব্ববঙ্গে পাঁচ লক্ষের কিছু বেশী।

প্রাচীনকালে এই সকল আদিম মানবগোষ্ঠীর মধ্যে মোঙ্গোলীয় মহাজাতির ভোটব্রহ্ম শাখার যে সকল লোক দার্জ্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের মধ্যে ভুটিয়া, নেওয়ার লেপচা প্রভৃতি প্রধান। অষ্ট্রেলয়েড বংশের সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা প্রভৃতি আসে ছোটনাগপুর এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে।

রাজবংশীরা বাংলার আর একটি প্রধান আদিম জাতি। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানতঃ এদের দেখতে পাওয়া যায় কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়, আর পূর্ব্ববঙ্গের রঙ্গপুরে এবং আসামের গোয়ালপাড়ায় এরাই হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। উত্তর আসামে এরা কোচ নামে পরিচিত। এদের দেহে আদিম কাছাড়ী এবং মধ্যভারতের ক্ষত্রিয় রক্ত বহমান। পূর্ব্ববঙ্গে পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা নামে আর একটি আদিম

পেশীবহুল এবং সুগঠিত। এরা খুব পরিশ্রমী আর কষ্টসহিষ্ণু। সাঁওতাল পুরুষদের দাঁড়িগোঁফ খুব ছোট ছোট—অনেকের আবার একেবারেই গজায় না।

কৃষিই এদের প্রধান জীবিকা হলেও এদের কৃষিপদ্ধতি এবং লাঙ্গল প্রভৃতি কৃষি-যন্ত্রাদি এখনো একেবারে আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে। আগে এদের লাঙ্গল ছিল শুধু কাঠের তৈরি, এখন এরা লাঙ্গলের মধ্যে যেমন-তেমন ভাবে একটা লোহার টুকরো জুড়ে দেয়।

সাঁওতালরা অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় আর বাঁশী বাজানোয় ওস্তাদ। সাঁওতালী বাঁশীর তান শুনে মুগ্ধ হতে হয়। সাঁওতাল পুরুষদের হাতে এই বাদ্যযন্ত্রটি সকল সময়েই আছে—পথ চলতে চলতে পর্য্যন্ত এরা বাঁশী বাজায়। এরা যখন খোশ মেজাজে থাকে তখন বহু লোক কোনো এক জায়গায় মিলিত হয় এবং বনফুলে দেহ সজ্জিত করে হাড়িয়া (ধেনো মদ) খেয়ে মত্ত হয়ে নৃত্য সুরু করে। নাচ এদের প্রত্যেক উৎসব এবং বিবাহ-অনুষ্ঠানের অপরিহার্য্য অঙ্গ। এরা ছেলে-বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ সবাই মদ্যপান করে এবং একসঙ্গে মিলে নৃত্য করে।

সাঁওতালরা প্রধানতঃ ভাত এবং বুনো ফল-মূল খেয়ে জীবন ধারণ করে। এরা গো-পালন করে শুধু ক্ষেত চষবার জন্যে—গরুর দুধ এরা খায় না।

মাংস এদের বিশেষ প্রিয় খাদ্য—প্রায় সব রকম জন্তু জানোয়ারের মাংস এরা খায়। মাটির বাসন-কোসন তৈরি করা, চামড়ার কাজ ইত্যাদি এরা আজও জানে না।

বয়সে তাঁর মায়ের ছোট এবং তাঁর মায়ের অনেক পরে পরিণয় হলেও মাসতুত ভায়ের জন্ম হয়েছে আগে, সুতরাং আইনতঃ এঁর দাবিই অগ্রগণ্য। যাই হোক্ ফতে খাঁনের দাবি টিকল না বটে, কিন্তু তিনি মাতুলের কথায় জৈন্তায়ই থেকে গেলেন। তিনি ছিলেন উন্নত ধরণের যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ, তাঁর শিক্ষায় জৈন্তার সৈন্যবাহিনী উচ্চাঙ্গের রণকৌশল আয়ত্ত করলে। ফতে খাঁন রাজধানীতে জয়ন্তেশ্বরীর মন্দিরের নিকটে একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করলেন। তখন পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীহট্ট জেলা থেকে দলে দলে মুসলমানেরা এসে জৈন্তাপুরে বসতিস্থাপন করতে লাগল। রাজা এতে কোনো আপত্তি করলেন না, মন্ত্রীরা কিন্তু এই ব্যাপারের ভাবী পরিণামের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন, শেষে তাঁদের নিয়োজিত এক ঘাতক একদিন রাত্রিবেলা ফতে খাঁনকে গুপ্তভাবে হত্যা করলে এবং মসজিদটি ভেঙে দেওয়া হল। এই শোচনীয় দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া অচিরেই দেখা দিল। খাসিয়া এবং সিণ্টেং রাজাদের মধ্যে দলগত বিরোধের সৃষ্টি হল। খৈরামের রাজা দাঁড়ালেন জৈন্তারাজের বিরুদ্ধে, ওদিকে আবার চেরার রাজা তাঁর পক্ষসমর্থন করলেন। যাই হোক্ মন্ত্রীদের বুদ্ধিকৌশলে অবশেষে বিরোধের অবসান হল।

রাজা বুড়া গোঁসাঞি ছিলেন পরম ভক্ত। তিনি এবং রাণী কাসমতী উভয়ে হরেকৃষ্ণ উপাধ্যায় নামক জনৈক বাঙালী শক্তি-সাধক কর্ত্তৃক তান্ত্রিক ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করবার পর তিনি সস্ত্রীক সংসার ত্যাগ করে জৈন্তার

কালীমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পুরোহিত লীলাপুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সন্ন্যাস-জীবন যাপন করতে থাকেন।

রাজা দ্বিতীয় রাম সিংহও (১৭৯০—১৮৩২) ছিলেন অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি সারি নদীর উপরকার পোলের নিকটবর্ত্তী ডুবি নামক স্থানে ছোট পাহাড়ের উপর একটি অভ্রভেদী মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

ব্রিটিশরা ১৭৬৫ সালে প্রথম দেওয়ানী হিসাবে শ্রীহট্ট লাভ করেন এবং ১৭৭৫ সালে তাঁরা শ্রীহট্টের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে বসেন। তাঁরা জৈন্তার উপর কোনো রকম হস্তক্ষেপ না করে পাহাড়ীদের সঙ্গে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসা দ্বারা প্রচুর লাভ করতে থাকেন। ১৮২৪ সালে জৈন্তার রাজার সঙ্গে ইংরেজদের এই সর্ত্তে সন্ধি হয় যে, তাঁরা তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ তো করবেনই না, উপরন্তু বাইরের আক্রমণের হাত থেকে জৈন্তারাজ্যকে রক্ষা করবেন। কিন্তু ইংরেজরা শেষ পর্য্যন্ত নিজেদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি, কৌশলে তাঁরা জৈন্তারাজ্যকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

নাগা-সম্প্রদায়

নাগাদের কথা আগেই কিছু কিছু বলেছি। আসামের আদিবাসীদের মধ্যে নাগাগোষ্ঠী একটি প্রধান গোষ্ঠী।

নাগারা আঙ্গামী, আও, সেমা, কাচা, রেঙ্গমা, লোটা, কনিয়াক সাংটাম প্রভৃতি বহু শাখায় বিভক্ত। মণিপুর-রাজ্যের

পার্ব্বত্য অঞ্চলসমূহও টাংখুল, মারাম, কলিয়া, খইরাও, কাবুই, কুইবেক, চিরু, মারিং ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগাদের দ্বারা অধ্যুষিত।

বিভিন্ন পরিবেশে একই গোষ্ঠীর আদিবাসীদের আকৃতি-প্রকৃতি আচার-ব্যবহার ইত্যাদির অনেক পরিবর্ত্তন হয় সত্য, কিন্তু কতকগুলি মজ্জাগত সংস্কার এরা কিছুতেই ছাড়তে পারে না। এই সমস্ত তুলনামূলক ভাবে বিচার করে নৃতত্ত্ববিদেরা আদিম জাতিদের মধ্যে জ্ঞাতিত্বের সূত্র আবিষ্কার করেন। আর একটি জিনিষ এ বিষয়ে তাঁদের সাহায্য করে। সেটি হচ্ছে আদিম জাতিসমূহের ভাষা। একই গোষ্ঠীর লোকেরা পরস্পরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে বাস করায় পরিবর্ত্তন যতই হোক্ না কেন, তাদের মধ্যে একটি ভাষাগত ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

এই তুটি মূল সূত্র ধরে অনুসন্ধান করে কোনো কোনো পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আসামের নাগাদের দেহে নেগ্রিটো রক্ত আছে এবং কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের রক্তের সম্পর্ক থাকা বিচিত্র নয়। নাগাদের চেহারা প্রধানতঃ মোঙ্গোলীয় ধাঁচের। কিন্তু ডক্টর হাটন এদের মধ্যে নেগ্রিটোসুলভ কতকগুলি লক্ষণও দেখতে পেয়েছেন। এর কারণ সম্বন্ধে গবেষণা করে পণ্ডিতেরা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা বলছি।

অষ্ট্রিকদের পর ভারতের বাইরে থেকে নিগ্রোয়েড জাতির

লোকেরা দক্ষিণ ভারতে এসে বসতি স্থাপন করে। এরা এসেছিল দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে অষ্ট্রিকরা প্রথমে এদের মাথা গলাতে দেয় নি। সেজন্যে গোড়ায় দক্ষিণ-ভারতেই এদের বসতি সীমাবদ্ধ ছিল। তারপর আস্তে আস্তে পূর্ব্বদিকে এগুতে এগুতে তারা ইন্দোনেশীয় উপদ্বীপে গিয়ে হাজির হয় এবং সেখানে বসবাস করতে থাকে। অষ্ট্রিকদের সঙ্গে তাদের প্রচুর রক্তের মিশ্রণ হয়। কালক্রমে এই মিশ্র নিগ্রোয়েড এবং অষ্ট্রিক জাতির লোকেরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আসামে প্রবেশপূর্ব্বক, সে-দেশের পূর্ব্ব-প্রান্তস্থ পাহাড়শ্রেণীতে বসতি-স্থাপন করে। এরাই হল নাংগা, অর্থাৎ—স্বর্গ থেকে আগত মানুষ। নাগা কথাটা এই নাংগারই অপভ্রংশ। নাগারা সমুদ্র-শঙ্খ এবং কড়ি দিয়ে দেহকে সাজাতে ভালবাসে। এগুলির প্রতি এদের অত্যাসক্তি থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, একদা এদের বসতি ছিল সমুদ্রতীরে।

নাগারা যে নেগ্রিটো এবং অষ্ট্রেলয়েড বংশের মিশ্রণে উৎপন্ন একটি দোআঁশলা জাতি এই সিদ্ধান্ত খুবই সমীচীন। নাগাদের মধ্যে অষ্ট্রিক এবং নিগ্রো সংস্কৃতির একটা বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। এরাও জুম কৃষিতে অভ্যস্ত, নাগাপাহাড়ের গায়ে ধানের ক্ষেতগুলি দেখতে ভারি সুন্দর। নিগ্রোদের বর্শার অনুরূপ বর্শা তাদের প্রধান হাতিয়ার; অষ্ট্রিকদের মাদলের ন্যায় মাদল নাগাদের

প্রধান বাদ্যযন্ত্র, আর অষ্ট্রিক 'জু' (ধেনো মদ) তাদের প্রধান পানীয়।

বিভিন্ন পাথুরে প্রমাণ থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, নাগারা খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দু' হাজার বছর আগে বিভিন্ন সময়ে আসামে এসে আড্ডা গেড়েছিল। পাহাড়ের পাদদেশে যে-সকল নাগা বাস করে সুদূর অতীতকাল থেকেই তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি উপলক্ষে সমতল-বাসীদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ফলে কামরূপ এবং মণিপুরের শিল্পকলা নাগাশিল্পকে কতকটা প্রভাবিত করেছিল। আসামের ইতিহাসে আহোম এবং নাগাদের যোগাযোগের অনেক প্রমাণ আছে। অতীতে এক আহোম-রাজা তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে জনৈক নাগা-সর্দ্দারের বাড়ীতে নির্ব্বাসিত করেন। সেখানে যথাসময়ে রাণীর একটি পুত্রসন্তান জাত হয়। এই ছেলেটি বড় হলে পরে আহোম-রাজা তাঁকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করে আহোম-দরবারে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আহোম-রাজা স্বর্গদেও সুকিমফা তাঁর রাজান্তঃপুরের এক কুমারীকে জনৈক খুনরাও অর্থাৎ নাগা রাজকুমারের হস্তে সম্প্রদান করেন। এমনি ভাবে নাগা এবং আহোম এই দুই রাজবংশের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্বর্গদেও গদাধর সিংহ, জয়ধ্বজ সিংহ প্রমুখ আহোম-রাজারা নাগা-কন্যাদের পাণিগ্রহণ করেছিলেন। আসামের ইতিহাস পড়লে জানা যায় যে, নির্ব্বাসিত রাজা গদাধর সিংহ যখন অরণ্য-পর্ব্বতে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন

তখন নাগারা তাঁকে সমাদরে আশ্রয় দিয়েছিল। জনশ্রুতি এই যে, মণিপুরের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপশালী রাজা গরীব নেওয়াজ ছিলেন নাগাবংশীয়।

সকল শ্রেণীর নাগারাই যে উলঙ্গ এবং সর্ব্ববিধ সংস্কৃতি-বর্জ্জিত তা নয়। পাহাড়ের সুদূরতম এবং গহন অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের কথা অবশ্য আলাদা। তা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর নাগারা বস্ত্রবয়নে পটু, বিবিধ প্রকার কারুশিল্পে তাদের নৈপুণ্য আছে। এদের বর্শা. দায়ের হাতল, বাঁশে তৈরি মদের পাত্র ইত্যাদির কারুকার্য্য প্রশংসনীয়। নাগাদের মধ্যে সব দিক দিয়ে আঙ্গামীরাই শ্রেষ্ঠ। গজদন্ত-শিল্পে এদের বিশেষ কৃতিত্ব আছে।

আঙ্গামী নাগা

কোহিমার নাগারা আঙ্গামী নাগা নামে পরিচিত। পুরুষগুলি প্রত্যেকেই লম্বায় অন্ততঃ ছ-ফুট। এদের মাংসপেশীবহুল সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহের সৌষ্ঠব দু-দণ্ড তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে, আঙ্গামী মেয়েরাও বেশ ফরসা আর দীর্ঘাঙ্গী। পুরুষদের গলায় শাঁখের টুকরো দিয়ে তৈরি মালা, সর্দ্দারদের কণ্ঠহারের মাঝখানে গোটা এক একটি শঙ্খ ঝুলানো, বাহুতে হাতীর দাঁতে তৈরি বাজুবন্ধের মত একপ্রকার গয়না। গায়ে হাতাহীন কালো জামা। এদের কাছা-না-দিয়ে-পরা কালো রঙের কটিবাসে গাঁথা সারি সারি কড়ি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আগেকার দিনে মানুষের মাথা কেটে আনতে না পারলে আঙ্গামী পুরুষেরা পরিধেয়তে কড়ি গাঁথবার অধিকারী হত না। পরণের বস্ত্রখণ্ডে গাঁথা কড়ির সারির সংখ্যা থেকে কে কি পরিমাণ নরহত্যা করেছে তা বুঝা যেত।

আসামের অন্যান্য অনেক আদিম জাতির তুলনায় আঙ্গামী নাগারা ঢের বেশী বুদ্ধিমান। নাগাপাহাড়ে বেড়াতে গেলে আঙ্গামীদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হতে হয়, অতিথির জন্যে এরা দরাজ হাতে খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় না। এদের চরিত্রের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এদের সদা-হাস্যময় ভাব আর কৌতুকপ্রিয়তা।

রেঙ্গমা নাগা

আসামের নাগাদের মধ্যে যে কয়টি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আছে রেঙ্গমারা তাদের অন্যতম। ১৯৩১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী এদের লোকসংখ্যা মাত্র ৪৯৬৮ জন।

রেঙ্গমারা প্রধানতঃ দুটি শাখায় বিভক্ত। পূর্ব্বাঞ্চলের রেঙ্গমা আর পশ্চিমা রেঙ্গমা। পূর্ব্বাঞ্চলের রেঙ্গমারা বাইরের সংস্রব থেকে অনেকটা মুক্ত আছে। মাত্র ২৫।২৬ বৎসর আগে ব্রিটিশজাতি এদের স্বাধীনতা লোপ করে, সুতরাং নাগাদের আদিমতম আচার-ব্যবহারের একেবারে খাঁটি রূপটি এদের সমাজে দেখতে পাওয়া যায়।

রেঙ্গমাদের চেহারা মোঙ্গোলীয় ধাঁচের। সাধারণতঃ এদের মাথার চুল খাড়া। কিন্তু ঢেউখেলানো এবং কোঁকড়ানো



উৎসব-সজ্জায় রেঙ্গমা নাগা



উপজাতীয় উৎসবে
বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত নাগাদল



উৎসব-সজ্জায় রেঙ্গমা নাগা



উপজাতীয় উৎসবে
বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত নাগাদল

কালো চুলও বিরল নয়। এতে এইটেই প্রমাণিত হয় যে, এদের শরীরে মিগ্রোয়েড রক্ত আছে।

ইদানীং রেঙ্গমারা লজ্জা নিবারণের জন্যে অল্প-স্বল্প কাপড়-চোপড় পরা শিখেছে, কিন্তু খুব বেশী দিনের কথানয়, যখন সকল রেঙ্গমা পুরুষই একেবারে উলঙ্গ থাকত। গায়ের একখানা চাদর ছিল তাদের একমাত্র অঙ্গাবরণ। আজকাল মেয়েরা খুব ছোট একটি কাপড়ের টুকরো কোমরে গেরো দিয়ে পরে। পূর্ব্বাঞ্চলের রেঙ্গমাদের মধ্যে লেফোরি গ্রামের অধিবাসীরা নেংটি পরিধান করে। নেংটিটি কোমরের ঘুন্‌সিতে আটকানো এবং তুটি প্রান্তই স্নমুখের দিকে ঝুলানো।

রেঙ্গমাদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভাত, এরা সকল রকম জীব-জন্তুর মাংসই আহার করে। ছোট ছোট জানোয়ার এবং পাখীদের বেলায় রান্না করার হাঙ্গামা এরা পোহায় না। গোটা প্রাণীটাকে আগুনে ফেলে দিয়ে ঝল্‌সে নেয়। পশু-পক্ষীর মাংস, হাড়-গোড়, চামড়া সবকিছুই এরা পরম পরিতৃপ্তির সহিত আহার করে—বহুদিন আগে মৃত পশুর পচা মাংসেও আপত্তি নেই। এরা মরা ব্যাঙের মাংস শুকিয়ে খেতে ভালবাসে। রেঙ্গমারা জল খুব কম খায়। ধেনো মদই এদের প্রধান পানীয়। এরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মদ্য পান করে।

২০।২৫ বছর আগে রেঙ্গমারা যখন ইংরেজের অধীনে আসে নি তখন তাদের সামাজিক অপরাধ ইত্যাদির বিচারের ভার ছিল গ্রাম্য পঞ্চায়েতের উপর।

প্রত্যেক রেঙ্গমা গ্রামেই পালাক্রমে এক একজন করে গ্রাম-প্রধান নির্ব্বাচিত হ'ত—তার পদবী ছিল কখুগু। কখুগুর পদ ছিল বিশেষ দায়িত্বপুর্ণ, তাকে জনমতের নির্দ্দেশ মেনে চলতে হত।

অন্যান্য আদিম জাতির ন্যায় রেঙ্গমরাও প্রেতোপাসক। উপদেবতাদের ও লোকান্তরিত পিতৃপুরুষদের প্রীত্যর্থে বিভিন্ন পূজানুষ্ঠান করে পশু ও মোরগ বলি দেওয়া হয়। উপদেবতাদের এরা বলে সেঙ্গিন্যু।

লোটা নাগা

নাগাপাহাড়ের দয়াং নদীর উভয় তীরবর্ত্তী অঞ্চলে লোটা নাগাদের বাস। এদের লোকসংখ্যা কুড়ি হাজারের বেশী নয়। যাবতীয় নাগাসম্প্রদায়ের মধ্যে লোটাদের ভিতরেই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার হয়েছে সব চেয়ে বেশী।

লোটা পুরুষমাত্রেরই রকমারি গয়নাগাঁটির প্রতি বিশেষ আসক্তি আছে। কানের তেলোয় প্রকাণ্ড ফুটো করে তাতে তারা গোঁজে সুতোর গুচ্ছ। এ ছাড়া তারা কানের তেলোয় পেতলের আঙ্‌টিও পরে। লোটারা কনুইয়ের উপর হাতীর দাঁতে তৈরি বাজুবন্ধের মত এক প্রকার গয়না পরে। মানুষের মাথা কেটে বাড়ীতে এনে যে লোটা-পুরুষ একটি বিশেষ উৎসব সম্পন্ন করেছে সে-ই কেবল সারি সারি কড়ি দিয়ে তৈরি চুড়ি (খকা়প) পরতে পারে।

লোটা পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের গয়নাগাঁটির বালাই কম। কানের তেলোয় তারা লাল পশমী সুতো দিয়ে এক-রকম পাখীর পালক জড়িয়ে রাখে। গলায় তাদের কলার বীচির মালা; কনুইয়ের উপর রূপদস্তার তৈরি গোলাকার মোটা বালা—কব্জীতে চার পাঁচ গাছা করে ছোট ছোট চ্যাপ্‌টা পিতলের চুড়ি।

প্রত্যেক নাগাগ্রাম দুই বা ততোধিক 'খেল' অর্থাৎ পাড়ায় বিভক্ত। প্রত্যেক খেলে অবিবাহিত যুবকদের একটি আড্‌ডা-ঘর বা 'মোরাং' আছে। লোটাদের সমাজ-জীবনে এই মোরাঙের প্রভাব খুব বেশী। মোরাঙের আর এক নাম চাম্পু।

আগেকার দিনে যুদ্ধযাত্রায় বের হবার পূর্ব্বে সলাপরামর্শাদি এই চাম্পুতেই হ'ত এবং নিহত শত্রুর ছিন্ন মুণ্ড এখানেই প্রথম আনা হ'ত।

অন্যান্য নাগাদের মত আগেকার দিনে লোটাদের মধ্যেও নরমুণ্ড শিকার এবং সংগ্রহের প্রথা ছিল। মাঝে মাঝে ভিন্ন গ্রামে হানা দিয়ে তারা নরমুণ্ড শিকার করত। মুণ্ডসংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিজগোষ্ঠীর কাউকে হত্যা করার রেওয়াজ অবশ্য তাদের সমাজে ছিল না; কিন্তু ভিন্ন গোষ্ঠীর স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে সবাইকে হত্যা করে তারা তাদের মাথাগুলি কেটে নিয়ে আসত। যে সকল শিশুর দাঁত উঠে নি, তাদের মুণ্ডগুলি কেটে তারা পথের পাশেই ফেলে দিয়ে চলে যেত। পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের মুণ্ডই বেশী দামী বলে গণ্য হ'ত।

তখনকার দিনে লোটারা যুদ্ধে জয়লাভ করে শত্রুর কর্ত্তিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বস্ত্রখণ্ডে জড়িয়ে নিয়ে নিজেদের গৃহাভিমুখে রওনা হত। এই বিজয়ী দল স্বগ্রামের প্রান্তসীমায় পৌঁছে তারস্বরে চীৎকার করে বলে উঠত—"ও শামাসারি"—অর্থাৎ, "আমরা দুশমনদের নিকাশ করেছি।" এই অতিপরিচিত প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি শুনে গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই মনে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হত, গ্রাম-প্রত্যাগত বিজয়ী বীরদলের অভ্যর্থনা করবার জন্যে তারা "ও ইমাইইয়ালি" (আমরা খুশী হয়েছি) একথা বলতে বলতে ছুটে আসত, তারপর মুণ্ডশিকারীদের মিছিল সারা গ্রাম প্রদক্ষিণ করে মোরাঙে গিয়ে মদ্যপানে রত হত।

ভূমিকম্প, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সম্বন্ধে লোটারা অদ্ভুত ধারণা পোষণ করে। তারা মনে করে, পৃথিবী সমতল এবং তার শেষ কোথায় তা জানা যায় না। ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে এদের ধারণা অনেকটা আমাদের পৌরাণিক বর্ণনার অনুরূপ। তারা বলে, পশ্চিমদিকে অস্তরবির দেশে যেখানে আকাশ আর ধরণী পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে সেখানে নাকি বাস করে এক বিরাটকায় বিষধর—সে যখন গা ঝাড়া দেয় তখনই পৃথিবী কেঁপে উঠে। তাদের মতে সূর্য্য হচ্ছে একটা অতিকায় আগুনের থালা—আয়তনে এক একর জমির সমান। তারাগুলি হচ্ছে এক একটি আগুনের ফুল্‌কি, তাদের নাকি প্রাণ আছে। যদি লোটাদের বলা যায় যে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় তা হলে তারা হেসেই উড়িয়ে দেবে। তারা

বলে মেঘের সঙ্গে বৃষ্টির কোনো সম্বন্ধ নেই। আকাশে নাকি আছে অগণিত বিরাট জলাধারসমূহ। আকাশের দেবতা 'পটস্থুরা' পৃথিবীকে শীতল করবার জন্যে মাঝে মাঝে সেগুলি থেকে জল ঢেলে থাকেন। যদি আকাশে মেঘের পানে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করা যায় মেঘগুলো তবে কি? তা হলে তারা স্মিতহাস্যে বলবে, সারা দুনিয়ায় রোজ এত যে উনুন ধরানো হয় আর আগুন জ্বালানো হয় তারই ধোঁয়া আকাশে উঠে জমাট বেঁধে ওরকম দেখায়।

লোটাদের সামাজিক বিধান অনুসারে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক অবিবাহিত যুবক রাত্রে মোরাঙে শয়ন করতে বাধ্য।

আও নাগা

নাগাপাহাড়ে দুটি মহকুমা—কোহিমা আর মককচঙ্গ, মককচঙ্গ মহকুমায়ই প্রধানতঃ আও নাগাদের বাস।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আও নাগাদের দেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদের মধ্যেও অন্যান্য গোষ্ঠীর নাগাদের ন্যায় মানুষের কেটে আনার রেওয়াজ ছিল। আওরা বিশ্বাস করত যে, মানুষের মাথা যত বেশী কেটে আনা যাবে ততই গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হবে, কৃষি-ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা-শক্তি বাড়বে।

অন্যান্য কোনো কোনো সম্প্রদায়ের নাগাদের মত আও পুরুষেরাও প্রায় নগ্ন থাকে। পরণে তাদের প্রায় দশ ফুট

দীর্ঘ আর আন্দাজ দশ ইঞ্চি চওড়া এক একটি 'লেংটা' (অসমীয়া ভাষা থেকে ধারকরা শব্দ—মানে নেংটি)। পূর্ব্বাঞ্চলের কোনো কোনো গ্রামের আওদের পরণের নেংটি খুলে ফেলে একেবারে দিগম্বর হয়ে মাছ ধরতে দেখা যায়।

গরু, শূকর, কুকুর মোরগ, চিল ইত্যাদি কোনো পশু-পক্ষীর মাংসেই এদের অরুচি নেই। গুবরে পোকা, মাকড়সা, বোল্‌তা প্রভৃতি হচ্ছে এদের পরম উপাদেয় খাদ্য।

হাতের কাজে আওদের বিশেষ দক্ষতা আছে। কাঠ খোদাই করে তারা রকমারি জিনিষ তৈরি করে। তন্মধ্যে মাদলগুলি দেখতে যেমন বিরাট তেমনি সুদৃশ্য। এগুলির দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩৭ ফুট এবং বেড় চৌদ্দ ফুট। বহু আয়াসে একটি গোটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ কুঁদে এই মাদল তৈরি হয়। মাদলটির অগ্রভাগে মোষের মাথা খোদাই করা হয়। এই খোদাই করা মোষের জিহ্বার উপর আবার মানুষের মুখ ক্ষোদিত থাকে। আওদের নিকট. এই মাদল প্রায় উপাস্য দেবতার সামিল। মাদলের অধিষ্ঠাতা উপদেবতার তৃপ্তিবিধানের জন্যে সময় সময় মোরগ ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। আগেকার দিনে মাদল-পূজার প্রধান উপচার ছিল নরমুণ্ড।

তাঁতবোনা, রঞ্জন-শিল্প, বয়ন-শিল্প, ইত্যাদিতে আওদের বিশেষ দক্ষতা আছে। তাঁতবোনার রেওয়াজ এদের ঘরে ঘরে। যে আও-কুমারী সুতা কাটতে কিংবা তাঁত বুনতে জানে না, তার পক্ষে ভাল ঘর ও বর জোটাই মুশকিল। আও

নাগারা জাত-শিল্পী। বস্ত্রশিল্প ছাড়া মৃৎশিল্প, কাঠের কাজ, চর্ম্ম-শিল্প, পাথর খোদাই, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি বিভিন্ন শিল্পকর্ম্মে আওদের নৈপুণ্য আছে।

অন্যান্য আদিম জাতির ন্যায় আও নাগারাও বিবিধ উপচারে উপদেবতাদের পূজা করে থাকে। তাদের ধারণা উপদেবতারা বিরূপ হলে শস্যাদি বিনষ্ট হয় এবং নানা আধি-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। এদের খুশি রাখবার জন্যে তারা বিবিধ জীবজন্তু বলিদান করে। বড় বড় মচ্ছবের সময় মুশকিল আসানের জন্যে এরা সূর্য্য-চন্দ্র এবং গ্রাম ও শস্যক্ষেত্রের উপদেবতা "ৎসুংগ্রেম" আর "টিয়া" প্রভৃতির নিকট প্রার্থনা করে। যাবতীয় উপদেবতার মধ্যে ৎসুংগ্রেমরাই প্রধান। মানুষের সুখ এবং সুস্থতা নাকি এদের মর্জির উপর নির্ভর করে। এরা সর্ব্বত্র বিরাজমান—গাঁয়ের ভেতরে, পথে-প্রান্তরে, শস্যক্ষেত্রে, বনে-জঙ্গলে, নদীর ধারে, গাছপালায়—সর্ব্বত্রই নাকি এদের আস্তানা।

নাগাদের অতীত ইতিহাস

মহাভারতে নাগরাজ্য এবং নাগরাজ-দুহিতা উলূপীর কথা পাওয়া যায়। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন দিগ্বিজয়-যাত্রায় বেরিয়ে পূর্ব্ব-ভারতে গিয়ে মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। উলূপী ছিলেন চিত্রাঙ্গদার সখী। মণিপুরীরা অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধর বলে আত্মপরিচয় দেয়।

তারা একথাও বলে যে বর্ত্তমান নাগাপাহাড়েই ছিল উলূপীর পিতা নাগরাজার রাজ্য।

মহাভারতের যুগ থেকে ব্রিটিশ আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাগাদের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কেবলমাত্র 'আহোম-বুরঞ্জী'গুলিতে মাঝে মাঝে তাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কাছাড়ী-রাজধানী ডিমাপুরের পতনের পর কোহিমা অঞ্চলের অধিবাসী আঙ্গামীরা খুব প্রতাপশালী হয়ে উঠে। তারা খনোমা আর মজোমা গ্রামের সর্দ্দারদের নেতৃত্বে শিবসাগর ও নওগাঁ জেলার সমতল অঞ্চলে গিয়ে হানা দেয় এবং সাময়িক ভাবে বিশেষ উপদ্রবের সৃষ্টি করে। শেষে কিন্তু আঙ্গামী-সর্দ্দারের সঙ্গে মজোমা-সর্দ্দারের বিবাদ বেধে উঠে।

ব্রিটিশদের সঙ্গে প্রথম নাগাদের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় ১৮৩১ সালে। একদল ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী ইম্‌ফল থেকে শিবসাগর পর্য্যন্ত প্রসারিত রাস্তাটি পরিদর্শন করতে গেলে পর নাগারা তাদের প্রচণ্ডভাবে বাধা দেয়। তখন মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিংহ নাগাদের শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে এক বিরাট সৈন্যদল নিয়ে তাদের উপর চড়াও হন। নাগাদের পরাস্ত করে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গোটা নাগাপাহাড় তিনি নিজ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গম্ভীর সিংহের মৃত্যুর পর নাগারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং শিবসাগর ও নওগাঁ জেলায় বেপরোয়া লুঠতরাজ করতে থাকে।

নাগাদের অত্যাচার যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল, নওগাঁস্থ ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারী তখন তাদের দমন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন। ১৮৩৮ থেকে ১৮৪০ এই তিন বৎসরে তিনি যথাক্রমে হাফলং, নওগাঁ-ডক, মোহংদিজুয়া-ডিমাপুর এবং গোলাঘাট-ডিমাপুর রাস্তা দিয়ে পর পর অনেকগুলি অভিযাত্রী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন। কিন্তু বার বার অভিযান প্রেরণ করে, এমন কি সমতল থেকে নাগাদের দেশ অবরোধ করেও ইংরেজদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। এই সময় খনোমা এবং মজোমার সর্দ্দারের বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করায় কৌশলী ইংরেজদের সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত হল। অবশেষে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লেঃ ভিন্‌সেণ্ট নাগাদের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করে বিশেষ সাফল্যলাভ করেন। অতঃপর নাগাদের সমস্ত ঘরোয়া বিবাদের অবসান হয় এবং গোটা নাগাপাহাড় ব্রিটিশের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে।

বড়গোষ্ঠী

কাছাড়ী

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে হিমালয়ের প্রান্তবাসী এবং আসামের অধিবাসী কিরাত নামক এক জাতির লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাজসেনীয় সংহিতা এবং অথর্ব্ববেদে বলা হয়েছে যে, কিরাতরা পর্ব্বতের গুহায় বাস করে। কালিকাপুরাণে আছে— কিরাতরা বেঁটে, এদের গায়ের রং সোনালী, মাথা কামানো, গায়ের চামড়া খসখসে। এরা মদ্য এবং মাংসে বিশেষ আসক্ত।

সুদূর অতীতে আসামে এই কিরাতজাতির বিশেষ প্রভাব ছিল। কলিকাপুরাণে ঘোটক নামে এক কিরাতরাজার কথা পাওয়া যায়—তিনি নরকাসুরের আসাম আক্রমণকালে (খ্রীঃ পূঃ ২২০০ অব্দে) আসামে রাজত্ব করতেন।

কারা ছিল এই কিরাত জাতির লোক ? পণ্ডিতেরা বলেন, প্রাচীনকালে তিব্বত, মধ্য-এশিয়া এবং চীনদেশ থেকে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা উত্তরপূর্ব্ব দিককার বিভিন্ন পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার জন্যে আসামে আসত। সিল্কের কারবারই ছিল এদের প্রধান ব্যবসা এবং এদেরই বলা হত কিরাত। সুতরাং কিরাত কথাটা দ্বারা সাধারণ ভাবে মোঙ্গোল জাতির লোকেদের, এবং বিশেষ ভাবে উক্ত মহাজাতির বড়গোষ্ঠীর মানুষদের বুঝাত। আসামে অষ্ট্রিকদের প্রভাব যখন হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে তখন হিমালয়ের উত্তর এবং চীনের পশ্চিম অঞ্চল থেকে চীন-ভোট জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার এই বড়গোষ্ঠীর লোকেরা হিমালয় অতিক্রম করে এসে আসাম আক্রমণ করে। এই আদিম জাতির অধ্যুষিত অঞ্চলই 'বড' নামে পরিচিত ছিল।

কিরাত জাতীয় মানুষদের সম্বন্ধে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "যজুর্বেদে আমরা যে "কিরাত-জাতীয় মানুষের উল্লেখ পাই, তারা (পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখ থেকেই এটা অনুমোদিত হয়) এই মোঙ্গোল জাতীয় মানুষ ছিল বলেই মনে হয়। উত্তরে হিমালয়ের দেশই এই কিরাত জাতির দেশ ছিল—সংস্কৃত সাহিত্যে এই রকম কথাই পাই, তবে কিরাতরা বা মোঙ্গোলরা—যারা সমগ্র ভারতে

ছড়িয়ে পড়তে পারে নি—উত্তর ভারতে হিমালয় অঞ্চল, আর সম্ভবতঃ উত্তর বিহার, উত্তর আর পূর্ববঙ্গ আর আসামই ছিল তাদের ক্ষেত্র।”

এই কিরাতজাতির লোকেরা ছিল নৃত্য-গীতে নিপুণ, করতাল এবং বড় বড় মাদল ছিল এদের বাদ্যযন্ত্র। এরা গুটিপোকার চাষ করত এবং সেগুলি থেকে যে সিল্ক পাওয়া যেত তাই দিয়ে ঝলমলে মিহি ও মসৃণ কাপড় তৈরি করে নীল, লাল এবং হল্‌দে রঙে রাঙাত। সেই সুদূর অতীত-কালে এই আদিম জাতির লোকেরাই প্রথমে আসামে বিভিন্ন প্রকারের সিল্কের কাপড় প্রস্তুতের প্রথা প্রবর্ত্তন করে।

বডগোষ্ঠীর যে-শাখার লোকেরা প্রথম আসামে আসে তাদের আদি বাসস্থান ছিল সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মোঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমির নিকটে ডিলাউব্রা আর চাঙ্গিব্রা নদীর সঙ্গমস্থলে কোনো এক স্থানে। সুদূর অতীতে উক্ত অঞ্চল প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে মরুভূমিতে পরিণত হওয়ায় তারা পিতৃভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণপূর্ব্ব দিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং প্রথমে হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এসে আশ্রয় নেয়। ক্রমে ক্রমে আসামের কামরূপে গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করে।

এই বডজাতির লোকেরা দীর্ঘকাল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজত্ব করেছিল। পরে তারা উন্নততর শক্তির নিকট পরাভূত হতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু আসামের সংস্কৃতিতে বড সভ্যতা আপন অনপনেয় প্রভাবের চিহ্ন রেখে গেছে।

বর্ত্তমান কালে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর-তীরস্থ যে আদিম জাতিটি কাছাড়ী নামে পরিচিত—অসমীয়ারা যাদের বলে কছাড়ী, তারা বড বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। কাছাড়ীদের লোকসংখ্যা লক্ষাধিক। কাছাড়ী ছাড়া আসামের মেচ চুটিয়া মোরান বরাহী গারো ; আসামের বাইরে উত্তরবঙ্গের কোচ, পার্ব্বত্য ত্রিপুরার টিপরা প্রভৃতি বহু জাতির লোকেরা এই বডগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

কালক্রমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বডজাতির (কাছাড়ীদের) এক শাখার লোকেরা অনিবার্য্য কারণে ব্রহ্মপুত্র অতিক্রম করে দক্ষিণদিকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এরা ডিমাশা কাছাড়ী নামে পরিচিত। এই ডিমাশাদের অতীত ইতিহাস বেশ ঘটনাবহুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। সেকথা আমরা যথাস্থানে বলব। এখন ডিমাশাদের জ্ঞাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সমতল অঞ্চলের বাসিন্দা বড বা কাছাড়ীদের রীতি-নীতির কথা বলছি।

বড বা কাছাড়ীদের কথা

দরং জেলায় যে-সমস্ত বড বা কাছাড়ী বাস করে তাদের বস্তিগুলি বেজায় নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। বাড়ীগুলি খুব ঘেঁষা-ঘেঁষি ভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক কাছাড়ী গৃহস্থই অনেকগুলি শূকর এবং অন্যান্য পশু পোষে। কাছাড়ীরা বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে গভীর খাল খনন করে তার পাড়ে ইকড় এবং বাঁশ দিয়ে মজবুত বেড়া তৈয়ার করে। এরা প্রায় সকলেই গুটি-

পোকার চাষ করে। এদের তাঁতগুলি খুব সাদাসিধে ধরণের। কাছাড়ী গৃহিণী এবং পরিবারের অন্যান্য মেয়েরা গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে তাঁত বোনে। মেয়েরা অবসর সময়ের বেশীর ভাগই বস্ত্রবয়নে ব্যয়িত করে, ধানের বীজও মেয়েরাই বুনে থাকে।

কাছাড়ীদের বিশ্বাস, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য মোদাই বা ভূতযোনিসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। পাছে ভূতেরা অমঙ্গল ঘটায় এই ভয়ে তারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত। কেউ পীড়িত হলে এরা মনে করে যে, লোকটির উপর মোদাই ভর করেছে। শূকর ছাগল ইত্যাদি বলি দিয়ে মোদাইগুলিকে খোশ মেজাজে রাখাই এদের ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ।

এদের দু'রকম উপাস্য দেবতা আছে। (১) গৃহদেবতা (২) গ্রামদেবতা। এদের প্রধান উপাস্য গৃহদেবতার নাম বাতাউ ; 'সিজু' নামক বৃক্ষবিশেষ তাঁর প্রতীক। কাছাড়ীদের গৃহপ্রাঙ্গণে বেড়া দিয়ে ঘেরা সিজু গাছ দেখতে পাওয়া যায়। আধিব্যাধি এবং মড়ক ইত্যাদি সর্ব্ববিধ দৈবদুর্ব্বিপাকের হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে ছাগল, শূকর, মোরগ, কলা, পানসুপারি প্রভৃতি বিবিধ উপচারে বাতাউকে খুশী রাখা হয়। 'বাতাউর' পত্নীর নাম 'মাইনাও'। ইনি নাকি ধানক্ষেত পাহারা দেন। মাইনাউ ঠাকুরাণীর মুরগীর ডিমের উপর প্রবল আসক্তি এবং এই জিনিসটি তিনি কাছাড়ী ভক্তদের নিকট থেকে প্রচুর পরিমাণেই পেয়ে থাকেন।

কাছাড়ীরা হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা বিশেষ ভাবেই প্রভাবিত হয়েছে। তাদের গ্রামদেবতাদের অধিকাংশই পৌরাণিক হিন্দু দেবদেবী, যথা—বুড়া মহাদেও (মহাদেব), জলকুবের রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি।

"মিখাম গা-ধন জানাই" "মহু হানাই" প্রভৃতি দু'একটি মাত্র এদের নিজস্ব জাতীয় পালপার্ব্বণ আছে। অসমীয়া হিন্দুদের অনুকরণে এরা জানুয়ারী মাসে একবার এবং এপ্রিল মাসে আর একবার "বিহু" উৎসব প্রতিপালন করে। জানুয়ারীর উৎসব সাধারণতঃ মাসের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের কয়েক সপ্তাহ আগে থেকেই যুবকেরা কতকগুলি খোড়ো ঘর নির্ম্মাণে রত হয় এবং গুটিকতক লম্বা বাঁশ মাটিতে পুঁতে সেগুলির চারপাশে শুকেনা ঘাস এবং খড় ইত্যাদি জড়ো করে রাখে। উৎসবরাত্রে এগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের কোনো কোনো জেলার হিন্দুদের দ্বারা অনুষ্ঠিত "ভেড়াঘর পোড়া" উৎসবের সাদৃশ্য আছে। এপ্রিলের "বিহু" পরবের প্রথম দিনে অসমীয়াদের প্রথামত গরুগুলিকে নিকটবর্ত্তী নদী কিংবা পুষ্করিণীতে নিয়ে গিয়ে স্নান করানো হয়। এপ্রিলের উৎসব সাত দিন ধরে চলে, ডিমাশা বা পাহাড়ী কাছাড়ীরা কেবলমাত্র একটি "বিহু" উদ্‌যাপিত করে।

বড়জাতির প্রাচীন ইতিহাস

বডজাতির অতীত ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত। সমগ্র বড জাতি-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোচ এবং কাছাড়ীরাই সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিলাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে কোচ-রাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে কোচজাতি গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিল। নরনারায়ণের ভ্রাতা শিলারায় ছিলেন সারা উত্তরপূর্ব্ব ভারতের সমকালিক বীর সেনা-নায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। আজও কাছাড়ীরা অন্যতম গ্রামদেবতা রূপে তাদের সেই জাতীয় মহাবীরের পূজা করে থাকে। কামখ্যার মাতৃমন্দির, হাজোর হয়গ্রীব মাধবের মন্দির প্রভৃতি কামরূপে কোচরাজাদের বহু কীর্ত্তিচিহ্ন আজও বিদ্যমান।

বডজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সূচনা হল প্রকৃতপক্ষে আহোমদের আসাম আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই। ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে আহোমরা পাতকোই পর্ব্বত অতিক্রমপূর্ব্বক আসামে প্রবেশ করেই উক্ত পর্ব্বতের পাদদেশস্থ ভূখণ্ডের মালিক বডগোষ্ঠীর মোরান এবং বরাহীদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। (কামরূপের বরাহ পালবংশের রাজপুত্রেরা বড-রমণীদের পাণিগ্রহণ করেন। এই আর্য্য ও অনার্য্য রক্তের সংমিশ্রণে যে সঙ্কর-জাতির উৎপত্তি হয় তারাই বরাহী নামে পরিচিত।)

যাই হোক্, আহোমদের সঙ্গে লড়াইয়ে এই মোরান এবং বরাহী উভয় জাতিরই হার হল। বিজিত মোরানদের উপর আহোমরা অকথ্য অত্যাচার করে। মোরানরা কিন্তু

এই অত্যাচারের কথা ভুলতে পারে নি, পুরুষানুক্রমে এরা প্রতিশোধস্পৃহা অন্তরে পুষে রেখেছিল এবং কয়েক শতাব্দী পরে এরা আহোমরাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মোরান এবং বরাহীদের পরাজিত করে আহোমরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলের অধিবাসী চুটিয়াদের সঙ্গে যুঝতে আরম্ভ করলে। প্রায় দেড়শ কিংবা ছ'শ বছর এরা আহোমদের ঠেকিয়ে রেখেছিল, কিন্তু অবশেষে এরাও হেরে গেল।

আগেই বলেছি যে, কাছাড়ীদের মধ্যে একদল লোক ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অতিক্রম করে দক্ষিণ দিকে গিয়ে নূতন বসতি স্থাপন করেছিল। এরা পালিয়ে যায় দরঙ্গের বরাহী-রাজার এক বড-মন্ত্রীর সঙ্গে। ইনি বর্ত্তমান নওগাঁ শহরের পাঁচ মাইল পূর্ব্বদিকে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। এঁর পুত্র বিক্রমাদিত্য আরো একটু সরে গিয়ে মিকির পাহাড়ের ঢালু জায়গায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ক্রমে ইনি এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হন। অবশেষে নাগাপাহাড়ের নিকটে প্রথমে দয়াং, পরে ধনশিরি নদীর তীরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই নূতন রাজধানীর নামকরণ হয় ডিমাপুর।

অতীতে যে সকল দেশত্যাগী কাছাড়ী এই ডিমাপুরে এসে বসবাস সুরু করে, তারাই হচ্ছে ডিমাশা কাছাড়ী। ডিমাশারা হিড়িম্বার বংশধর বলে আত্ম-পরিচয় দেয়।

দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন নাকি বড়কন্যা হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। মহাভারতে এই অনার্য্য-রমণীকে হিড়িম্বা রাক্ষসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর্য্যদের নিকট ডিমাশারা রাক্ষস বলেই পরিচিত ছিল।

আসাম বেঙ্গল রেলপথের মণিপুর রোড ষ্টেশনের কাছে 'নামবার' নামক এক নিবিড় জঙ্গলে কাছাড়ী রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। চারিদিক ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি প্রশস্ত স্থানে ভগ্নাবশেষগুলি বিদ্যমান, তন্মধ্যে ছোট-বড় অনেকগুলি বেলেপাথরের স্তম্ভ বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আসামের ইতিহাস-লেখক গেট সাহেব বলেন, কাছাড়ীরা যে তৎকালে আহোমদের চেয়ে উন্নত জাতি ছিল ডিমাপুরের ভগ্নাবশেষ থেকে তা বুঝতে পারা যায়।

১৪৬০—১৫০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল কাছাড়ী-রাজারা নির্বিবাদে ডিমাপুরে রাজত্ব করেছিলেন। কিন্তু কাছাড়ী-রাজা খরোপার আমলে, আহোমরাজা স্বর্গনারায়ণ কাছাড়ীদের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাত্রাকে ব্যাহত করে তোলেন। ফলে উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়, (১৫২৬ খ্রীঃ)। যুদ্ধে খরোপা পরাজিত হন এবং প্রায় আট বৎসর ধরে কাছাড়ীরাজ্যে এক রকম অরাজকতা চলতে থাকে। একে তো কাছাড়ীরা আহোমদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তার উপর হঠাৎ কোচরাজা নরনারায়ণের সৈন্যবাহিনী কাছাড়ী-রাজ্যে হানা দেয়। এই সমস্ত কারণে কাছাড়ীরা রাজা মকরধ্বজের নেতৃত্বে ডিমাপুর ছেড়ে দক্ষিণপশ্চিম দিকে পশ্চাদপসরণ করতে থাকে।

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর হাচেংচা পরিবারের মেঘেন্দ্রনারায়ণ এই বাস্তুত্যাগী কাছাড়ীদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন এবং উত্তর কাছাড়ের মাহুর নদীর শস্যসমৃদ্ধ উপত্যকায় উপনীত হয়ে, স্থানীয় কুকিদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মাইবাং—এ (মাই-ধান, বাং—প্রচুর) নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

মাইবাং-এ কাছাড়ী রাজধানীর অনেক ভগ্নাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রাজা মেঘদর্পনারায়ণের নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদটির গঠন-কৌশল চমৎকার। রাজপ্রাসাদের বহিঃপ্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে দু'টি প্রস্তরনির্ম্মিত সান্ত্রীমূর্ত্তি ছিল, সেগুলি এখন হাফলং শহরের বাজারে এনে রাখা হয়েছে।

অবশেষে মাইবাং-এর উপরেও আহোমরাজার কোপদৃষ্টি পতিত হল। রাজা রুদ্র সিংহ বারংবার মাইবাং-এ অভিযাত্রী সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে লাগলেন। অগত্যা তদানীন্তন কাছাড়ী-রাজা তাম্রধ্বজ সিংহ আরো দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে, বরাক উপত্যকার বরাবর যে-স্থানটি তাঁর জনৈক পূর্ব্বপুরুষ ত্রিপুরা-রাজের নিকট থেকে খাসস্বরূপ পেয়েছিলেন সেখানে রাজধানী স্থাপন করে তার নামকরণ করলেন খাসপুর। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্র আর সেনাপতি তুলারামের স্মৃতিবিজড়িত এই খাসপুর স্বাধীন কাছাড়ী-রাজ্যের শেষ রাজধানী। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগ থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতে এই রাজ্যের ভিত্তিমূল শিথিল হয়ে আসতে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কাছাড়ী-রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ

করলেন। ফলে যা অনিবার্য্য তাই ঘটল—ব্রিটিশের কূটচক্রে কাছাড়ী-রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হল—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলেন।

কাছাড়ীদের বর্ত্তমান অবস্থা

কাছাড়ীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার খুব কমই হয়েছে। কিন্তু দশ বছর আগে যে অবস্থা ছিল সে তুলনায় বর্ত্তমান অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ। সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যমে কাছাড়ীদের অধ্যুষিত অঞ্চলে বহু মাইনর স্কুল এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক কাছাড়ী ছাত্র ম্যাট্রিক পাশ করে কলেজে গিয়েও ভর্ত্তি হচ্ছে।

আসামের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল কাছাড়ী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন তন্মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী রূপনাথ ব্রহ্ম বি, এল, ভূতপূর্ব্ব ভারতীয় গণপরিষদের সভ্য ধরণী বসুমাতারী, ব্যবস্থা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য রবিচন্দ্র কাছাড়ী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ রাভা অসমীয়া সাহিত্যকে স্বীয় রচনা-সম্ভারে সমৃদ্ধ করেছেন এবং আসামের রঙ্গমঞ্চ এবং চলচ্চিত্র-শিল্পেরও উৎকর্ষ-সাধন করেছেন। তিনি একাধারে একজন বিখ্যাত লেখক, সঙ্গীতবিদ্, অভিনেতা এবং রাজনৈতিক নেতা।

গারো

গারোপাহাড় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এই পাহাড়ের উত্তরপশ্চিম দিকে গোয়াল-

পাড়া জেলা, দক্ষিণে ময়মনসিংহ আর পূর্ব্বদিকে খাসিয়া ও জৈন্তা পাহাড়। এই পাহাড়ই হচ্ছে গারোদের দেশ—অবশ্য পার্শ্ববর্ত্তী ময়মনসিংহ, গোয়ালপাড়া, কামরূপ, খাসিয়া-জৈন্তা-পাহাড় প্রভৃতি জেলাসমূহেও গারোদের বিপুল সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। গারোরাও মোঙ্গোলীয় জাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার অন্তর্গত। তিব্বতীয় ভাষার সঙ্গে তাদের ভাষার কতকটা মিল দেখতে পাওয়া যায় এবং আরো কোনো কোনো বিষয়ে এই উভয় জাতির মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তিব্বতের গ্রামাঞ্চলের ঘণ্টা-কাঁসর গারোদের নিকট মহামূল্যবান বস্তু বলে গণ্য।

পণ্ডিতেরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, গারোজাতিও বডগোষ্ঠীর অন্তর্গত। বিভিন্ন বড-উপভাষার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কাছাড়ীদের ভাষার সঙ্গেই গারো-মিল সকলের চেয়ে বেশী। বডগোষ্ঠীর অন্তর্গত সকল আদিম জাতির মধ্যে কাছাড়ীরাই গারোদের নিকটতম আত্মীয়। কিন্তু দীর্ঘকাল বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে বাস করায় পরস্পরের জ্ঞাতি হলেও গারো এবং কাছাড়ীদের রীতি-নীতিতে আকাশ পাতাল পার্থক্য দাঁড়িয়ে গেছে।

আচার-ব্যবহার ইত্যাদির দিক দিয়ে বরং খাসিয়াদেরই সঙ্গে এদের বেশী মিল দেখা যায়। গারোরা বহুকাল খাসিয়াদের অধীনে ছিল, সুতরাং এটা আশ্চর্য্য নয় যে, বিজেতা খাসিয়াদের অনেক রীতি-নীতি এরা নিজেদের সমাজে প্রবর্ত্তন করেছে। এই দুটি জাতির মধ্যে বহুল পরিমাণে বৈবাহিক

সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে—গারোপাহাড়ের কোনো কোনো অঞ্চলে এরা গারো-খাসিয়া এই নামে পরিচিত। খাসিয়াদের ন্যায় গারোদের সমাজেও মাতৃপ্রাধান্য প্রথা প্রচলিত। এদের মধ্যেও স্ত্রীলোকেরাই সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতেই শুধু পুরুষের অধিকার; কোনো অবস্থায়ই উত্তরাধিকারসূত্রে কিছু পাবার অধিকারী সে নয়। কেউ কেউ অনুমান করেন যে, গারোরা প্রতিবেশী খাসিয়াদের দেখাদেখি নিজেদের সমাজে এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেছে। আসামের মাতৃকপ্রথাবিশিষ্ট এ দুটি জাতির মধ্যেই খ্রীষ্টধর্ম্ম সবচেয়ে বেশী প্রসারলাভ করেছে। গারোপাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়ে থাকে। গারোরা পাহাড়ের পাদদেশস্থ সমতলের হাটে এই তুলা বিক্রী করে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে থাকে। কলিকাতা ও চট্টগ্রামের এজেন্টরা এই সমস্ত বাজারে তাদের কাছ থেকে তুলা কেনে।

গারোদের চেহারা মোঙ্গোলীয় ছাঁচের। প্রতিবেশী খাসিয়াদের চেয়ে এদের গায়ের রং ঢের বেশী ময়লা। এদের মুখ গোল এবং ছোট, চোখ ছোট ছোট ও তির্য্যক এবং নাক প্রায় সমতল বললেই চলে। অধিকাংশ গারোরই মাথার চুল কোঁকড়ানো এবং ঢেউখেলানো। গারো স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই বেঁটে। মেয়েদের উচ্চতা সচরাচর চার ফুট দশ ইঞ্চির বেশী নয়। গারো মেয়েরা দেখতে সুন্দরী নয়। বিশেষতঃ মধ্যবয়স অতিক্রম করবার পর থেকেই তাদের চেহারা কদাকার ধারণ করতে থাকে।

গারো পুরুষদের পরণের বস্ত্রখণ্ডের নাম গাণ্ডো। গাণ্ডো হচ্ছে ছয় ইঞ্চি চওড়া এবং আন্দাজ ছয় অথবা সাত ফুট লম্বা লাল ডোরাকাটা নীল রঙের একটি নেংটি। গারোরা মাথায় ঘন নীল কিংবা শাদা রঙের পাগড়ি বেঁধে থাকে, মেয়েরা একটি অপরিসর বস্ত্রখণ্ড কোমরে গেরো দিয়ে পরে—এর নাম রিকিং। তাদের দেহের উপরিভাগ থাকে সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত। পুরুষের ন্যায় মেয়েরাও মাথায় পাগড়ী বাঁধে।

গারো স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই গয়না-গাঁটি পরতে ভালোবাসে। পুরুষের প্রধান অলঙ্কার হচ্ছে ওঠংগা। এগুলি পাতলা পিতলে তৈরি একপ্রকার কর্ণভূষণ—আকার কতকটা মাকড়ির মত। কোনো কোনো গারো পুরুষের কানে এ ধরণের ত্রিশ চল্লিশটি ওঠংগা দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষদের মাকড়ির অনুরূপ গয়না (সিসা) মেয়েরাও কানে পরে। সেগুলি উদ্ভট আকারের এবং আয়তনে অনেক বড়। এক একটি সিসার পরিধি চার ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। এগুলি ওজনে বেশ ভারী—মেয়েরা এক এক কানে পঞ্চাশটিরও অধিক সিসা ধারণ করে। এই গহনার ভারে মেয়েদের কানের তেলো প্রথমে আকারে বড় হয়ে ঝুলে পড়ে, তারপর দু'ভাগে বিভক্ত হয়, শেষে খসে পড়ে যায়—কানের নিম্নাংশের অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু কানের দফা রফা হলেও এই গহনার মায়া মেয়েরা কাটাতে পারে না। তখন তারা মাথায় দড়ি বেঁধে সেগুলিকে ছিন্ন কানের দু'পাশে ঝুলিয়ে রাখে। আগেকার দিনে এ সমস্ত কর্ণভূষণের পরিধি ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত হত। এই অপরূপ

কর্ণভূষণের দরুন গারো মেয়েদের স্বভাবতঃ বিশ্রী চেহারাকে বিকটতর দেখায়।

গারোদের বিবাহ-প্রথা আসামের সমুদয় আদিম জাতির থেকে আলাদা ধরনের। এদের সমাজে বিয়ের প্রস্তাব ছেলের নয়, মেয়ের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়। এটা কতকটা স্বয়ম্বর প্রথার মত। কনে নিজেই নিজের পাত্র নির্ব্বাচন করে। তার পর পাকা দেখার (?) জন্যে নিজের বাপ ভাই অথবা কাকাকে মনোনীতের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। এ প্রথার মূলেও রয়েছে নারীপ্রাধান্য।

গারোদের অতীত ইতিহাস

আগেকার দিনে পাহাড়িয়া গারোদের স্বাধীনতা পুরোপুরি বজায় ছিল। তারা নিজস্ব জাতীয় পদ্ধতিতে নিজেদের অঞ্চল শাসন করত। প্রত্যেক গ্রামে একজন করে গ্রামপ্রধান থাকত এবং কতিপয় গ্রাম মিলিত ভাবে একজন রাজার ('বুনিয়া' বা 'নাকমা'র) আনুগত্য স্বীকার করে চলত। রাজা নির্ব্বাচিত হতেন সর্ব্বসাধারণের সম্মতিক্রমে—স্থানীয় সবচেয়ে পুরনো বনেদি পরিবারের লোকেদের দাবি ছিল সর্ব্বাগ্রগণ্য। এই রকম চার জন রাজা সমগ্র গারোপাহাড়ের শাসন-কার্য্য পরিচালনা করতেন।

পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তসীমাস্থ সমতল অঞ্চলের গারো রাজা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কপিলি উপত্যকার পলাতক রাজা পদ্মনাভ কর্ত্তৃক নিজ-রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন এবং পশ্চিম

দিকে পালিয়ে গিয়ে সুসঙ্গ নামে ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন ; পরে তিনি এক ব্রাহ্মণের নিকট এই রাজ্য বিক্রী করে দেন।

তখনকার দিনে গোয়ালপাড়া, ময়মনসিংহ, এবং রঙ্গপুর জেলার প্রান্তসীমাবাসী এবং দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলের গারোরা তুলা মরিচ প্রভৃতি বিক্রী করবার জন্যে মাঝে মাঝে সমতলে আসত এবং সমতলের হাট থেকে ধান, লবণ, কাপড়চোপড় ইত্যাদি কিনে নিয়ে দেশে ফিরে যেত। ঐ সকল অঞ্চলের শাসনকর্ত্তারা তাদের নিকট থেকে কর আদায় করতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রত্যেক 'পাস' বা 'দুয়ারে' এক এক জন করে লস্কর নিযুক্ত করতেন। সমতলের ব্যবসায়ীরা এবং শাসনকর্ত্তাদের নিযুক্ত লস্কররা গারোদের সঙ্গে প্রায়ই প্রতারণা করত। গারোরা তাদের প্রবঞ্চনার কথা টের পেলে তাদের মাথা কেটে শোধ তুলত। এই কর্ত্তিত মুণ্ডগুলি পাহাড়ে খুব চড়া দামে বিক্রী হ'ত। এটা ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

কাশ্যপনগর (পরবর্ত্তী কালে করাইবাড়ী ষ্টেট নামে পরিচিত) এবং মেচপাড়া গারোপাহাড়ের সংলগ্ন অঞ্চল বলে, গারোদের তুলোর উপর একচেটে অধিকার স্থাপনের জন্যে উপরিউক্ত দু'টি স্থানের ব্যাবসায়ীদের পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি ছিল। এই দু'টি অঞ্চলের শাসনকর্ত্তারা এক প্রকার স্বাধীনই ছিলেন। বাংলাদেশ যখন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃত্বাধীনে আসে তখনও তাঁদের স্বাধীনতায় সরাসরি কোম্পানির হাত পড়ে নি। করাইবাড়ীর শাসনকর্ত্তা সূর্য্যনারায়ণ (১৭৪০-৭৬) একবার নিতান্ত অকারণে অতর্কিতে গারোপাহাড়ের উপর

চড়াও করে কতকগুলি গ্রাম পুড়িয়ে দেন এবং গ্রামবাসীদের কর দিতে বাধ্য করেন। তাঁর পুত্র ধর্ম্মনারায়ণ পিতার পন্থা অনুসরণ করে পাহাড়িয়া অঞ্চলে আরো কিছুদূর, পর্য্যন্ত নিজ-রাজ্যের সীমারেখা সম্প্রসারিত করলেন। এই বংশের শেষ সামন্ত-রাজ্য মহেন্দ্রনারায়ণ কখনো সঙ্গত কারণে, কখনো বা মিথ্যা অছিলায় প্রায়ই সসৈন্যে পর্ব্বতারোহণ করে গারোদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা কবতেন। তিনি পাহাড়ের পাদদেশে ফুলবাড়ী, বেলবাড়ী, সিঙ্গিমারি প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে রীতিমত সৈন্যবাহিনী মোতায়েন রাখেন। উক্ত অঞ্চলসমূহে এই সকল দুর্গ এবং মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায়। মহেন্দ্রনারায়ণ সমগ্র গারোপাহাড় সম্পূর্ণ ভাবে নিজের কর্তৃত্বা-ধীনে আনবার জন্যে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেন। ওদিকে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ দেখলেন যে, এই দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কোম্পানির অফিসার মিঃ বেয়ার্ডের নিকট থেকে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তরফের পত্র নিয়ে একজন দূত ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহেন্দ্রনারায়ণের নিকট গেলে পর তিনি বিশ্বাস-ঘাতকতাপূর্ব্বক তাকে বন্দী করেন। এমনি ভাবে মহেন্দ্র-নারায়ণের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করতে থাকে। গারো-সর্দ্দার রস্তা মহেন্দ্রর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রঙ্গপুরের কমিশনারের নিকট এই মর্ম্মে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন যে, তিনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আশ্রিত হয়ে থাকতে চান—

কমিশনার যেন তাঁকে সাহায্য করেন। মহেন্দ্র প্রচণ্ড প্রতাপে গারোপাহাড়ে প্রভুত্ব করতে লাগলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর দারুণ ভাগ্যবিপর্য্যয় দেখা দিল। তিনি পড়লেন অত্যন্ত দুরবস্থায়, জমির বকেয়া খাজানা দিতে না পারায় তাঁর সম্পত্তি নিলাম হয়ে গেল। রামনাথ লাহিড়ী নামে রঙ্গপুরের এক ব্রাহ্মণ, যিনি ছিলেন এক সময় মহেন্দ্র-নারায়ণের মন্ত্রী—২৩৫০০৲ টাকায় ঐ সম্পত্তি কিনে নেন। কিন্তু উক্ত সম্পত্তি নিয়ে মহেন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে তাঁর বিবাদ বেধে উঠে। এই সময় হঠাৎ (১৮১৫ খ্রীঃ) গারোরা মহেন্দ্রনারায়ণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং লাহিড়ীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। গারোরা প্রতিশোধ-কামনায় ক্ষিপ্ত হয়ে মহেন্দ্রনারায়ণের পরিবারের সবাইকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করে এবং মেচপাড়া ষ্টেটে বেপরোয়া খুনজখম ও লুঠতরাজ চালাতে থাকে। ব্যাপার গুরুতর দেখে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট গারোপাহাড়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁরা অচিরেই গারোদের দমন করতে সক্ষম হন। ব্রিটিশের অনুগ্রহে রামনাথ লাহিড়ী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মালিক হলেন। ওদিকে মেচপাড়ার শাসনকর্তা স্বেচ্ছায় ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অবশেষে সমগ্র গারোপাহাড় অঞ্চলে ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিকির

মিকিররা মোঙ্গোলীয় মহাজাতির ভোট-ব্রহ্ম শাখার সংখ্যাগুরু জাতিসমূহের অন্যতম। ১৯৪১-এর সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, মিকিরজাতির লোকসংখ্যা ১৪৯, ৭৪৬ জন। নওগাঁ আর শিবসাগরের মধ্যবর্ত্তী মিকির-পাহাড়ে প্রধানতঃ মিকিরদের বাস, কিন্তু এরা আসামের বিভিন্ন পার্ব্বত্য অঞ্চলে ও সমতলের বহু স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্ত্তমান কালে এদের নওগাঁ, খাসিয়া-জৈন্তা পাহাড়, কামরূপ, ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরস্থ দরঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় দেখতে পাওয়া যায়।

আসামের অন্যান্য আদিম জাতির লোকেদের তুলনায় মিকিররা অত্যন্ত নিরীহ, শান্ত এবং যুদ্ধবিমুখ জাতি। বিগত দুই শতাব্দী যাবৎ এরা অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার পরিত্যাগ করে শান্তভাবে ও নির্ব্বিবাদে বাস করে আসছে। মিকিররা কোন্ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন—এরা বড়গোষ্ঠীরই একটি শাখা, কাছাড়ী গারো প্রভৃতি বড়গোষ্ঠীর অন্যান্য লোকেদের বহু পরে এরা আসামে আসে এবং এদের সঙ্গে নাকি অষ্ট্রিকভাষী জাতিসমূহের প্রচুর রক্তের সংমিশ্রণ হয়েছে। কিন্তু আসামের আদিম জাতিদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ স্যার চার্লস লয়েল প্রচুর গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মিকিররা কুকি-চিন গোষ্ঠীর লোক। ব্রহ্মদেশের আরাকান রমা পাহাড়শ্রেণীর দক্ষিণ অঞ্চলের বাসিন্দা চিনজাতি ; কাছাড় জেলার দক্ষিণদিকস্থ পাহাড়শ্রেণী এবং মণিপুরের পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী কুকিজাতি এবং

আসামের দক্ষিণদিকস্থ লুসাইপাহাড়ের অধিবাসী লুসাইজাতিও এই কুকি-চিন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কুকি এবং চিনদের সঙ্গে মিকিরদের ভাষা ও আচার-ব্যবহারগত আশ্চর্য্যরকম মিল আছে। মণিপুরীরাও কুকি-চিন গোষ্ঠীর লোক। কিন্তু বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আওতায় এসে উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী হওয়ায় এঁরা কুকি-চিনদের সহিত জ্ঞাতিত্বের কথা অস্বীকার করেন।

মিকির নামটি অসমীয়াদের দেওয়া। মিকিররা কিন্তু নিজেদের আরলেং নামে পরিচিত করে। 'আরলেং' মানে মনুষ্যজাতি।

মিকিরদের গায়ের রং পীত। মেয়েদের মধ্যে কারো কারো চেহারায় বেশ শ্রীছাঁদ আছে। পুরুষদের অনেকেরই মাথার সামনের দিকটা কামানো, পেছন দিকে ঝুঁটি-বাঁধা দীর্ঘ কেশ ঘাড়ের উপর ঝুলানো।

মিকির-পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ খাসিয়াদের অনুরূপ। মেয়েদের বসনের বাহার আছে। পরণে তাদের লাল-সাদা ডোরাকাটা এণ্ডির কাপড়। এগুলি একটা নক্সাকাটা কোমরবন্ধের সাহায্যে কটিতে আটকানো থাকে। দেহের উপরিভাগ তারা একটি চাদর (জিসো) দিয়ে ঢেকে রাখে। মাথায় ঘোমটা দেওয়ার রেওয়াজ মিকির মেয়েদের নেই। তারা কপালে, নাকে, ঠোঁটে ও গালে উল্কি পরে। এদের কর্ণভূষণ ছাড়া অন্যান্য গয়নাগাঁটি সিটেং মেয়েদের মত। মিকির পুরুষেরা পূজা-পার্ব্বণ উপলক্ষে ভীমরাজ পাখীর পালক পাগড়িতে পরে থাকে।

আগেকার দিনে নিত্যব্যবহার্য্য যাবতীয় জিনিষ, যেমন—দা, ছুরি, সূচ, মাছ ধরবার বঁড়শী, এমন কি মেয়েদের হার, চুড়ি, আঙটি কর্ণভূষণ প্রভৃতি সোনা-রূপার গয়না-গাঁটি পর্য্যন্ত মিকিররা নিজেরাই তৈরি করত। কিন্তু আজকাল সাধারণতঃ সমতল অঞ্চল থেকেই এরা এ সমস্ত জিনিষ কিনে থাকে। তথাকথিত সভ্যসমাজের সহিত মেলামেশার দরুন এরা আজকাল কতকটা শ্রমবিমুখ হয়ে উঠেছে এবং নিজেদের কুটীর-শিল্পের প্রতি উপেক্ষা এদের দিন দিন বেড়েই চলেছে।

ভাত এদের প্রধান খাদ্যদ্রব্য। এরা গোমাংস খায় না, গরুর দুধেও এদের অরুচি। গুটিপোকা এদের একটি প্রিয় খাদ্য, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁকড়া, ইঁদুর ইত্যাদি খেতে বড় ভালবাসে। এরা মাঝে মাঝে ধেনো মদ তৈরি করে খায় বটে, কিন্তু নেশার মধ্যে আফিঙের উপরই এদের সবচেয়ে বেশী আসক্তি। মিকির এবং সিংফো ছাড়া আসামের আর কোনো আদিম জাতির লোকেরা আফিং খায় না।

মিকিররা বহুকাল হিন্দুরাজাদের অধীনে ছিল, সেজন্যে তাদের সমাজ-জীবনের উপর হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব পড়েছে। অসমীয়া হিন্দুদের নিকট থেকে এরা বৈকুণ্ঠ নরক প্রভৃতি নাম ধার করেছে এবং সেগুলি সম্বন্ধে নিজেদের মনগড়া আদর্শও খাড়া করেছে। মিকিরদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পর মানুষ পাতালে গিয়ে যম রেচোর (যম রাজার) সহিত কিছুকাল বাস করে। হিন্দুদের মতন মিকিররাও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। কামরূপের কামাখ্যা দেবীকেও এরা ভক্তি করে।

কিন্তু হিন্দুপ্রভাব সত্ত্বেও এরা নিজস্ব ধর্ম্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। আরনাম কেথে, পেং, হেম্ফু প্রভৃতি এদের অসংখ্য উপদেবতা আছে—কলেরা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাধি এবং সবরকম দৈবদুর্ব্বিপাক অপদেবতাদের কোপেই হয়ে থাকে বলে এদের ধারণা।

মিকিরদের সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠা মামাতো বোনই সেরা পাত্রী বলে বিবেচিত হয়। মামাতো বোন্ এবং পিসতুত ভাইয়ের মধ্যে বিবাহই নাকি আদর্শ বিবাহ।

মিকিররা বিপুল সমারোহের সঙ্গে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে। এই উপলক্ষে উৎসবের ধূম পড়ে যায়। উৎসবের প্রথম দিন থেকেই সুরু হয় বাদ্যসম্বলিত নৃত্য। উৎসবের চতুর্থ দিবসে কুমার-কুমারীরা উত্তম বেশ-ভূষায় সজ্জিত হয়ে সমবেত নৃত্যে মেতে উঠে।

অতীতে মিকিররা বহুকাল খাসিয়াদের অধীনে ছিল। খাসিয়াদের অনুকরণে এরা মৃতের উদ্দেশে পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করে তার সামনে একটি ডোবা কাটিয়ে দেয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর তারা মৃতের অস্থি বহন করে নিয়ে গিয়ে তার উপর প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করে এবং মৃতের আত্মার তৃপ্তিবিধানের জন্যে সেখনে মদ ভাত মাংস ইত্যাদি নিবেদন করে। এটি অষ্ট্রিক প্রথা; কিন্তু মিকিররা এর 'দহা' ('দশা' শব্দের অসমীয়া রূপান্তর) এই হিন্দু নামকরণ করেছে। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কুমার-কুমারীদের গীতসম্বলিত নৃত্য হয়। এই নৃত্যের নাম হুমান-কাং চাও-মেইন কাইয়াং,—অর্থাৎ দিব্য মানবদের নৃত্য।

মিকিরদের প্রাচীন ইতিহাস

মিকিরদের অতীত ইতিহাস পরবশ্যতার এবং একটানা দুঃখদুর্গতি ভোগের ইতিহাস। তখনকার দিনে আহোম, নাগা খাসিয়া প্রভৃতি সকল জাতিই এই শান্ত নিরীহ প্রকৃতির আদিবাসীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেছে।

মিকিরপাহাড়ের একপ্রান্তস্থ ফারোখোয়া (উর্দ্ধগঙ্গা) থেকে দীবলপানি পর্য্যন্ত এবং অন্যদিকে নুমালীগড় থেকে দেওপানি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অসংখ্য হিন্দুমন্দির এবং দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, অতীতে দীর্ঘকাল ধরে (৩৫০ খ্রীঃ থেকে—১১৩০ খ্রীঃ পর্য্যন্ত) গোটা মিকিরপাহাড় বর্ম্মণ, ম্লেচ্ছ এবং পাল - পর পর এই তিনটি রাজবংশের অধীনে ছিল।

পালবংশের পতনের পর মিকিররা বেশ কিছুকালের জন্যে পরবশ্যতার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল, কিন্তু কাছাড়ীরা যখন সোনাপুর, বানপুর এবং ডিমাপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করে চতুর্দ্দিকে প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করতে লাগল, তখন মিকিররা মনে মনে প্রমাদ গণল। শেষ পর্য্যন্ত কাছাড়ীদের হাতে আবার তাদের স্বাধীনতা লুপ্ত হল। কাছাড়ীদের সঙ্গে মিকিরদের ছিল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—কাছাড়ী-রাজারা নানা ভাবে তাদের শোষণ করতেন। যখন কাছাড়ী-রাজধানী ডিমাপুর থেকে মাইবাং-এ স্থানান্তরিত হল তখন কাছাড়ী-রাজা মিকিরদের শাসন-ভার অর্পণ করলেন একজন রাজপ্রতিনিধির উপর। ইনি মিকিরদের উপর অকথ্য অত্যাচার করতে লাগলেন।

তাঁর পরবর্ত্তী রাজপ্রতিনিধিরাও একই নীতি অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। ফলে মিকিরদের দুঃখদুর্গতির আর পরিসীমা রইল না। কাছাড়ী-রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মিকিররা শেষ পর্য্যন্ত জৈন্তারাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নেয়। নওগাঁ জেলার কোনো কোনো অঞ্চল তখন জৈন্তারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বাস্তত্যাগী মিকিররা শেষে নওগাঁ জেলার লঙ্কার নিকটে রংখাং-এ গিয়ে বসতি স্থাপন করে। থোং নোক বে নামে এক ব্যক্তি ছিলেন মিকিরদের সমাজে ব্যতিক্রম—তিনি ছিলেন মহাবলী কুস্তিগীর এবং ওস্তাদ যোদ্ধা। জৈন্তারাজ তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর পরিবারের লোকেদের রং খাং রাজ্যে উচ্চ পদে বাহাল করা হয়। কালক্রমে তাঁদের বংশধরের রং খাং মিকির বলে পরিচিত হয়। এই রং খাং মিকিররা আজও মিকিরদের সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মোড়লি করে থাকেন।

মিকিররা যখন জৈন্তারাজ্যের অধীনে ছিল তখন তারা ধীরে ধীরে খাসিয়া এবং সিণ্টেংদের অনেক আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে।

আহোমরা যখন আসামে খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে তখন কয়েকজন রহা মিকির-সর্দ্দার আহোম-রাজার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। আবার মিকিরদের অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় শোচনীয়। জাতির এই দুঃসময়ে মিকিরদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন এক বীর যোদ্ধা—তিনি মিকিরদের ভীরুতার অপবাদ ঘোচাতে সক্ষম হলেন। নাম তার হরত কুঁয়র (কুমার)। এই হরত কুঁয়র কে ছিলেন তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার আর অন্ত নেই।

হয় তিনি ছিলেন একজন মিকির, আর নয়তো এমন একজন হিন্দু যিনি মিকিরদের দুঃখে বিগলিত হয়ে তাদের সমাজে বাস করে তাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। হরত কুঁয়র আহোমদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে মিকিরদের ডাক দিলেন। আহোমরা হরত কুঁয়রের প্রতাপ দেখে আতঙ্কিত হয়ে বিশ্বসাঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁকে হত্যা করলে।

মিকিররা কিন্তু বিশ্বাস করে যে হরত কুঁয়র মরেও মরেন নি। একদিন আসবেন তিনি সকল দুঃখদুর্গতি, সকল লাঞ্ছনা-অপমানের হাত থেকে তাদের মুক্তি দিতে। জাতির সেই ভাবী মুক্তিদাতার প্রতীক্ষায় তারা দিন গুণছে।

হরত কুঁয়রের কথা মিকিরদের কল্পনাকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে যে, তাঁকে নিয়ে তারা রূপকথা পর্য্যন্ত রচনা করেছে। মিকির রূপকথা 'হরত কুঁয়র' পৃথিবীর যে-কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ রূপকথার পাশে স্থান পাবার যোগ্য।

ব্রিটিশদের আগমনের প্রাক্কালে মিকিরদের দুঃখের বোঝা একেবারে দুর্ব্বহ হয়ে উঠল। একদল ছিল রহার শাসনকর্ত্তার অধীনে,আর একদল ছিল মৌডাঙ্গার সেনাপতি তুলারামের প্রজা। ওদিকে নাগারা আবার ঘন ঘন হানা দিয়ে মিকিরদের মাথা কেটে নিত।

ব্রিটিশেরা আসামে এসে আহোমদের পরাজিত করে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করবার পর ক্রমে ক্রমে একটি একটি করে আসামের বিভিন্ন আদিম জাতির স্বাধীনতা লোপ করতে লাগল, মিকির-পাহাড়কেও তারা নিজেদের এলাকাভুক্ত করে নিলে।

মিকিরদের পক্ষে এই বিদেশীদের বশ্যতা-স্বীকার হল শাপে বর। প্রতিবেশী দুর্দ্দান্ত জাতিদের অত্যাচারের হাত থেকে তারা চিরতরে নিষ্কৃতি পেলে।

লুসাই জাতি

শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার দক্ষিণ অংশে লুসাই পাহাড়ে লুসাই জাতির বাস। শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণপ্রান্তে আর ত্রিপুরা এবং উত্তর-কাছাড়ের পার্ব্বত্য অঞ্চলেও লুসাইদের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্পর্কিত কোনো কোনো আদিম জাতির লোক বাস করে। নাগা বলতে যেমন বহু সম্প্রদায়ের নাগাদের বুঝায় কুকি কথাটি দ্বারা তেমনি একই গোষ্ঠীর নানা উপজাতিদের বুঝায়। লুসাই ছাড়া চট্টগ্রামের অধিকাংশ পার্ব্বত্য জাতি, কাছাড়ের থাডো এবং খাউটলাং (যাদের স্থানীয় নাম নূতন এবং পুরাতন কুকি) ব্রহ্মসীমান্তের চিন পাহাড়ের অধিবাসী চিন, ইত্যাদি বিভিন্ন পাহাড়িয়া জাতির লোকেরা কুকি-চিন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। লুসাই পুরুষেরা ৪।৫ হাত লম্বা এবং হাত দুই চওড়া একটি বস্ত্রখণ্ড কাছা না দিয়ে পরে। রংবেরঙের ডোরাকাটা কাপড় এদের খুব পছন্দসই। বর্ষাকালে তাদের চেরা বাঁশ অথবা বেতের তৈরি টুপি মাথায় পরতে দেখা যায়।

লুসাইরা যেখানেই যাক না কেন, রঙীন কাপড়ে তৈরি নানা টুকিটাকি জিনিষে ভরতি একটি থলে তাদের কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে ঝুলানো থাকবেই; আর তামাকের নল তো লুসাই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মুখে সব সময় লেগেই আছে। মেয়েদের

হুঁকোগুলো আকারে খুব ছোট। খুব ছোট ছোট লুসাই বালক-বালিকারা পর্য্যন্ত ধূমপানে অভ্যস্ত। মায়ের পিঠে বাঁধা ক্ষুদে লুসাইশিশু যখন চোখ বুঁজে তামাকের নলে সুখটান দিতে থাকে তখন দেখতে ভারি মজা লাগে।

লুসাই মেয়েদের পরনে হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বিত, পিতলের তার দিয়ে কোমরে আটকানো ঘন নীল রঙের বস্ত্রখণ্ড। তারা লম্বা হাতাওয়ালা একটি খাটো জামা গায়ে দেয় এবং একটি চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে।

লুসাই পুরুষদের মুখে দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই, যা-ও বা দু'এক গাছি গজায় তাও তারা নখ দিয়ে টেনে তুলে ফেলে। গয়নাগাঁটি পরবার দিকে লুসাই পুরুষদের বিশেষ ঝোঁক আছে। তারা চুলে খোঁপা বেঁধে তাতে পেতলের কাঁটা ইত্যাদি কত রকমারি অলঙ্কার যে গুঁজে রাখে তার আর অন্ত নেই।

একে তো লুসাই স্ত্রী-পুরুষের চেহারায় বিশেষ পার্থক্য নেই তার উপর উভয়ের গয়না-গাঁটি একইরূপ। সেজন্যে বিদেশীর পক্ষে প্রথম দৃষ্টিতে কে পুরুষ আর কে নারী তা চেনা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

লুসাই বাপেদের প্রায়ই ছেলে পিঠে করে পাড়া বেড়াতে দেখা যায়। একটু বড় হলেই ছেলেমেয়েরা কাজকর্ম্মে সাধ্যমত বাপ-মায়ের সাহায্য করে। লুসাই খুকীরা যখন ছোট ছোট দু' একটা বাঁশের চোঙ্ ঝরণার জলে ভর্ত্তি করে নিয়ে খুশীমনে মায়েদের সঙ্গে চড়াই ভেঙে পাহাড়ের উপর উঠতে থাকে তখন দেখতে ভারি আমোদ লাগে।

লুসাই-কুকি-গোষ্ঠীর প্রায় সকল শাখার লোকরাই পাখিয়ান নামক এক উপদেবতাকে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা বলে মনে করে। তিনি নাকি সৃষ্টি করেই খালাস, মানুষের সুখ দুঃখে তিনি উদাসীন। কিন্তু মানুষের রোগ-শোক ইত্যাদির বিধানকর্ত্তা হচ্ছেন 'হুয়াই' নামক অপদেবতারা— তাঁরা থাকেন পাহাড়-জঙ্গল, নদী-ঝর্ণা ইত্যাদিতে। লুসাইদের বিশ্বাস যে, ভূগর্ভে আছে এক প্রেতলোক যার নাম মিঠিখুয়া (মৃতের গ্রাম), আর মিঠিখুয়ার সুদূর প্রান্তসীমা দিয়ে প্রবাহিত পিয়াল নদীর ওপারে আছে পিয়ালরাল অর্থাৎ আনন্দ-নিকেতন। কেবলমাত্র ঐহিক সুকৃতির বলে সেখানে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় না, পরলোকে গিয়ে বিধিমত পশুহত্যা, নরহত্যা ইত্যাদি পুণ্যকৃত্যের (?) অনুষ্ঠান করলে তবেই মানুষ সেই আনন্দধামে বাস করবার সৌভাগ্য লাভ করে।

ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী লুসাইদের দেশে প্রথম প্রবেশ করে, ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। আইজল (লুসাই পাহাড়ের বর্ত্তমান রাজধানী), চাংশিল এবং লুংলেতে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লুসাইরা একটি ব্রিটিশ ঘাঁটির উপর হানা দিয়ে একজন ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষকে হত্যা করে। প্রতিশোধগ্রহণের উদ্দেশ্যে ইংরেজেরা গোটা লুসাই পাহাড়ের উপর এলোপাথাড়ি আক্রমণ চালায়। লুসাইরা যুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং তাদের নেতাদের নির্ব্বাসিত করা হয়। বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করে ইংরেজরা লুসাই পাহাড় দখল করে।

মণিপুরী

ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা উপত্যকা-ভূমিতে ক্ষুদ্র একটি রাজ্য নাম তার মণিপুর—বিচিত্র এই দেশ, তারও চেয়ে বিচিত্র এখানকার মানুষগুলি। প্রকৃতি এদেশে যেন সৌন্দর্য্যের হাট খুলে বসেছেন। মণিপুরের রাজধানীর নাম ইম্ফল। ইম্ফল থেকে ২৭ মাইল দূরবর্ত্তী আন্দাজ আট মাইল দীর্ঘ এবং পাঁচ মাইল প্রশস্ত লোগতাক নামক হ্রদটির সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এই হ্রদের সুদূরপ্রসারিত জলরাশির উপর দিয়ে জলজ পুষ্পে খচিত দ্বীপমালা স্রোতের টানে দিনরাত ভেসে বেড়ায়।

এই সুন্দর দেশে যে সকল লোক বাস করে তাদের সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করেছেন। এঁরাও আদিম জাতির লোক, কিন্তু অন্যান্য আদিম জাতিসমূহের তুলনায় এঁরা শিক্ষায় দীক্ষায়, ধর্ম্মাচরণে, সংস্কৃতিতে এবং বিশেষ ভাবে বিভিন্ন শিল্পকলার অনুশীলনে কেমন করে এতদূর উৎকর্ষলাভ করতে সক্ষম হয়েছেন তা ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। আসামের সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে একমাত্র মণিপুরীদেরই নিজস্ব বর্ণমালা আছে। এঁদের ভাষার নাম মৈতেই ভাষা। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে মৈতেই ভাষায় লেখা যে-সকল পুরনো পুথি আছে সেগুলি থেকে মণিপুর-রাজবংশের অনেক বিস্মৃত কাহিনী জানতে পারা যায়।

জগতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে মণিপুরীদের একটি বিশিষ্ট দান আছে—সে তাদের নৃত্যকলা। মণিপুরী নৃত্য খাঁটী

ভারতীয় নৃত্য—এটি ভারতের অন্যতম প্রধান গৌরবের জিনিষ। কিন্তু ভারতের এই নিজস্ব জাতীয় সম্পদের কথা ভারতবাসী আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। বর্ত্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এর রসমাধুর্য্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেন এবং মণিপুরী নৃত্যশিক্ষক আনিয়ে শান্তিনিকেতনে এই নৃত্যকলা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। আজ সারা ভারতে মণিপুরী নাচের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। যে-জাতির মধ্যে সুদূর অতীতে এমন শ্রেষ্ঠ নৃত্যকলার বিকাশ হয়েছিল তারা যে কিরূপ উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী আমরা তা আজ বুঝতে পারছি।

যে জাতির মধ্যে যত বেশী বিভিন্ন শ্রেণীর রক্তের মিশ্রণ হয় সে জাতির মধ্যে তত উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি বিকাশ লাভ করে। মণিপুরীরা মিশ্র জাতি। বহু জাতির সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে মণিপুরের সংস্কৃতি পুষ্ট হয়েছে।

মণিপুরীরা প্রধানতঃ দু'টি শাখায় বিভক্ত (১) খা লা চাই (যারা নিজেদের বলে থাকে বিষ্ণুপুরীয়া) আর (২) মৈ-তেই (যারা খাস মণিপুরী বলে আত্মপরিচয় দেয়)। খা লা চাই বা বিষ্ণুপুরীয়ারাই মণিপুরে প্রথম আধিপত্য বিস্তার করে। কামরূপের কিংবা ভারতের অন্য কোনো স্থানের হিন্দুদের প্রভাবে তাদের মধ্যে বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত হয় এবং তারা নিজেদের রাজধানীর নাম রাখে বিষ্ণুপুর। মৈতেইরা মণিপুরে আসে তাদের পরে। বিষ্ণুপুরীয়া এবং মৈতেই ভাষার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমটির সঙ্গে কামরূপীয় ভাষার আশ্চর্য্যরকম সাদৃশ্য আছে। মৈতেইরা যে মধ্য-চীন

থেকে এদেশে এসেছিল তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। মৈতেই ভাষা ভোট-চীনা ভাষাবর্গের অন্তর্গত।

মণিপুরী সংস্কৃতির উপর যে বিভিন্ন সভ্যতার প্রভাব পড়েছে সেকথা আগেই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছি। মণিপুরের রাজকীয় চিহ্ন, পক্ষবিশিষ্ট সিংহ যে চীনের ৎসাং বংশের সাংস্কৃতিক প্রভাবের নিদর্শন তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। প্রত্যেক রাজার রাজত্বকালের দৈনন্দিন ঘটনাগুলি লিখে রাখার প্রথাও যে তদানীন্তন মণিপুরীরা চীনাদের কাছ থেকে শিখেছিল তাতে সন্দেহ নেই। অতীতে মণিপুরের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন জাতির লোকেরা দেশবিদেশে যাতায়াত করত, সেইজন্য মণিপুরীদের সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে নানা জাতির সাংস্কৃতিক প্রভাবের ছাপ রয়ে গেছে।

মণিপুরীদের মধ্যে অল্পসংখ্যক মুসলমান আছে, তা ছাড়া প্রায় সকলেই এখন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী, তারা শ্রীচৈতন্যের ভক্ত। মণিপুরের রাজা গরীব নেওয়াজের (গোপাল সিং) রাজত্বকালে সন্তদাস বাবাজী নামে শ্রীহট্টের নরসিংহ আখড়ার এক বৈষ্ণব গোস্বামী কাছাড়ের পথে জিরিঘাট পর্ব্বত অতিক্রম করে মণিপুরে গিয়ে পৌঁছেন এবং রাধাকৃষ্ণের লীলারসাত্মক কীর্ত্তন গেয়ে স্বয়ং রাজা এবং সমগ্র মণিপুরবাসীদের মোহিত করে ফেলেন। তাঁর ভক্তিপ্রবণতায় আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে মণিপুরী স্ত্রী-পুরুষ এসে তাঁর নিকট দীক্ষা নিতে থাকে। ক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্ম রাজপরিবারের ধর্ম্ম বলে গণ্য হয় এবং নবদ্বীপ হয়ে দাঁড়ায় মণিপুরীদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। কালক্রমে

মণিপুরে বাংলা ভাষার চর্চাও বিশেষভাবে সুরু হয়, আর মৈতেই অক্ষরের বদলে বাংলা অক্ষরে মণিপুরী ভাষার গ্রন্থাদি লিখিত হতে থাকে।

কিন্তু তাই বলে আদিম ধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠান কিন্তু এদের সমাজ থেকে একেবারে লোপ পেয়ে যায় নি। কৌব্রু, সেনামাহী, থাং জিং প্রভৃতি ঝড়বৃষ্টির অপদেবতাদের পূজা আদিম পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। মাইবা অর্থাৎ আদিম ধর্ম্মের পুরোহিত-গণের আজও মণিপুরে যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি। মণিপুরীদের উপাস্য অসংখ্য 'লাই' বা উপদেবতা আছে এবং মণিপুরীরা যে-সমস্ত উপচারে তাদের পূজা করে তা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত নহে। খাসিয়াদের উ থ্লেন পূজার ন্যায় এদের মধ্যেও সর্পপূজার প্রচলন আছে। কিন্তু খাসিয়াদের ন্যায় মণিপুরীরা কখনো নাগদেবতার প্রীত্যর্থে নরবলি দিত বলে শোনা যায় না।

মণিপুরীরা যে শুধু কলাবিদ্যার চর্চ্চাই করে থাকে তা নয়, দৈহিক শক্তির অনুশীলনেও তারা সমান মনোযোগী। মণিপুরীরা জাত-খেলোয়াড়। আমাদের অধিকাংশেরই ধারণা, পোলো আর হকি এ দু'টি ক্রীড়া ইংরেজেরাই আমাদের দেশে প্রবর্ত্তন করেন। এ ধারণা কিন্তু ভুল—আসলে পোলো (খাঞ্জাই সানাবা) এবং হকি (খোং খাঞ্জাই) মণিপুরীদের নিজস্ব জাতীয় ক্রীড়া। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে খগেনবার রাজত্বকালে মণিপুরে খাঞ্জাই সানাবা অর্থাৎ পোলো খেলার প্রবর্ত্তন হয়। ইম্ফলস্থ ইংরেজ রাজপুরুষগণ এই দু'টি ক্রীড়ার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁদের চেষ্টায় ধীরে ধীরে ব্যাপক ভাবে এগুলির

প্রচলন হতে থাকে। খোং খাঞ্জাই অর্থাৎ হকি ক্রীড়ার প্রতিই মণিপুরীদের আসক্তি সব চেয়ে বেশী। শিশুদের পর্য্যন্ত মহা উৎসাহে হকি খেলায় রত হতে দেখা যায়। সময় সময় বিরাট জনতার সমানে ছেলেদের হকি-প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রভাব মণিপুরের সর্ব্বত্র অনুভব করা যায়। শহর থেকে বহু দূরবর্ত্তী, মণিপুরের নিভৃততম অঞ্চলে বেড়াতে গেলেও এমন সব দেবমন্দির নজরে পড়ে যেগুলিতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। নিত্য সন্ধ্যায় এই সকল মন্দির বাংলা কীর্ত্তনগানে মুখরিত হয়ে ওঠে।

মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস

মণিপুররাজ চিত্রবাহনের কন্যা চিত্রাঙ্গদা এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পরিণয়ের কথা নাগাদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। মণিপুরীরা অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রূবাহনের বংশধর বলে আত্মপরিচয় দেয়।

পৌরাণিক যুগের কথা বাদ দিয়ে এখন একেবারে গোড়া থেকে মণিপুরের ইতিহাস বর্ণনা করছি।

প্রাচীন তাম্রশাসন, হাতে লেখা পুরণো পুঁথি আর জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, মণিপুরের প্রথম রাজার নাম পাখাংবা—৩৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর রাজত্বকাল সুরু হয়। তাঁর পরবর্ত্তী খোয়াই তম্পক নামে আর এক জন রাজা ছিলেন

সঙ্গীতকলার এক জন মস্তবড় পৃষ্ঠপোষক। তা' ছাড়া কো লোকেং, খোংটেকচা, কাবোম্বা, চলম্বা, মোগাম্বা, খগেনবা প্রভৃতি বিখ্যাত রাজাদের সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু পাখাংবার আমল থেকে গরীব নেওয়াজের সিংহাসনারোহণের কাল (১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত দেড় সহস্রাধিক বৎসরের ইতিহাস এখনো অনেকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন—এ সম্বন্ধে উপযুক্ত গবেষণা হলে মণিপুর তথা আসামের ইতিহাসের উপর নূতন আলোকপাত হবে।

খগেনবা (১৫৭৯-১৬৫১) ছিলেন প্রাচীন মণিপুরের একজন বিশেষ কীর্ত্তিমান রাজা, তিনি হিন্দূধর্ম্মের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি। ইয়েংবাম গ্রামে তিনি একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন—এটি এখনো খগেনবা বিষ্ণু নামে পরিচিত। রাজা খগেনবা ত্রিপুরা এবং কোচবিহার থেকে স্থপতিদের আনিয়ে মন্দির প্রাসাদ ইত্যাদি নির্ম্মাণ করান। তাঁরই চেষ্টায় বিষ্ণুপুরী ভাষার বদলে মৈতেই ভাষা রাজদরবারের ভাষারূপে গৃহীত হয়।

আদিবাসী রাজা পানহেইবা সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে। রাজা হবার পর তিনি হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন, কিন্তু গরীব নেওয়াজ অর্থাৎ (দরিদ্রের আশ্রয়) এই ফারসী উপাধি গ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই আমল থেকে মণিপুরের গৌরবময় যুগের সূচনা হয়। প্রবাদ যে, তাঁর পিতা ছিলেন নাগাবংশীয়। কালক্রমে গরীব নেওয়াজ বিশেষ প্রতাপশালী হয়ে

উঠেন। ত্রিপুরারাজের কাছ থেকে তিনি কাছাড় জেলার এক অংশ ছিনিয়ে নিয়ে আসেন। ব্রহ্মদেশে সাফল্যের সঙ্গে তিনি তিন তিনটি অভিযান পরিচালনা করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি অনেক বর্ম্মী শিল্পীকে বন্দী করে মণিপুরে নিয়ে আসেন। এদের দ্বারাই মণিপুরের দারুশিল্প এবং গজদন্তশিল্পের প্রবর্ত্তন হয়।

ব্রহ্মদেশের কতকগুলি জায়গা দখল করে গরীব নেওয়াজ অবশেষে ব্রহ্ম-রাজধানী আভায় গিয়ে হানা দিলেন। ব্রহ্ম-সৈন্যেরা যুদ্ধে প্রায় পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত এমন সময় উঠল প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের ঝাপ্‌টায় গরীব নেওয়াজের রাজকীয় পতাকা ছিন্নভিন্ন হয়ে ভূপতিত হল। এই অশুভ ঘটনায় অমঙ্গল আশঙ্কা করে তিনি যুদ্ধে বিরত হওয়াই সঙ্গত মনে করলেন এবং ব্রহ্মরাজের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে নিজ-রাজ্যে ফিরে এলেন।

কথিত আছে যে গরীব নেওয়াজ তাঁর পুত্র অজিত শাহের চক্রান্তে নিহত হন। তাঁহর মৃত্যুর পর থেকেই সুরু হয় মণিপুর-রাজ্যে ঘোর অরাজকতা। যে গৃহবিবাদ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব হিংসা দ্বেষ প্রভৃতির কাহিনী মণিপুরের ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করে রেখেছে তার সূত্রপাত প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই।

অজিত শাহ শুধু পিতৃহত্যা করেই ক্ষান্ত হন নি, পথের কাঁটা সরিয়ে ফেলবার জন্যে তিনি ভ্রাতা শ্যাম শাহকেও হত্যা করিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতা

ভরত শাহ কর্তৃক তিনি সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হন। ভরত শাহের মৃত্যুর পর প্রজারা তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌর শাহকে সিংহাসনে বসান। গৌর শাহের মৃত্যুর পর গরীব নেওয়াজের পৌত্র জয়সিংহ ওরফে ভাগ্যচন্দ্র (মণিপুরী নাম—চিটুংকম্বা) ১৭৬৪ সালে রাজপদে অভিষিক্ত হলেন।

ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশের মহাবীর আলংপায়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত ব্রহ্মবাসীরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতিতে পরিণত হয়েছে। যুদ্ধে তারা অপরাজেয়। মণিপুরের উপর ঘন ঘন আক্রমণ চালিয়ে তারা মণিপুরীদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

জয়সিংহ দেখেন সমূহ বিপদ। নিরুপায় হয়ে তিনি চট্টগ্রামের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ভেরেলষ্ট সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে হরিদাস গোস্বামী নামক একজন বাঙ্গালীকে দূত হিসাবে প্রেরণ করলেন।

জয়সিংহের আমন্ত্রণে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ভেরেলষ্ট ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীসহ কাছাড়ের পথে মণিপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পার্ব্বত্য প্রদেশের দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দরুন গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কাছাড়ের খাসপুর থেকেই তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করতে বাধ্য হন।

সময়োচিত সাহায্যলাভ করতে না পারায় জয়সিংহ ব্রহ্ম-বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং রাজ্যচ্যুত হয়ে কাছাড়ে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে (১৭৬৮) খ্রীষ্টাব্দে অবশ্য

তিনি হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। বৃদ্ধবয়সে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার তুলে দিয়ে শান্তিলাভের আশায় তিনি তীর্থপর্য্যটনে বের হন এবং ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে পদ্মাতীরস্থ ভগবানগোলায় পরলোকগমন করেন।

জয়সিংহের পঞ্চম পুত্রের নাম গম্ভীরসিংহ। শৌর্য্য বীর্য্য রণকুশলতা ইত্যাদি সব দিক দিয়েই ভ্রাতাদের মধ্যে ইনি ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর যোগ্যতা দেখে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মণিপুর থেকে ব্রহ্মবাহিনীকে বিতাড়িত করবার ভার তাঁর উপরে অর্পণ করেন। বর্ম্মীদের তাড়িয়ে গম্ভীরসিংহ মণিপুর-রাজ্যকে শত্রুমুক্ত করলেন।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হল। এই যুদ্ধবিরতি উপলক্ষে ব্রহ্মরাজের সঙ্গে ইংরেজদের যে সন্ধি হয় তা ইয়ান্দাবু সন্ধি নামে অভিহিত। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে একদিকে গম্ভীরসিংহ যেমন কোম্পানির আনুগত্য স্বীকার করে মণিপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন অন্যদিকে তেমনি ব্রহ্মরাজ মণিপুরাধিপতির শত্রুতাচরণে বিরত হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। গম্ভীরসিংহের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে অরাজকতা অন্তর্বিপ্লব ইত্যাদির অবসান হয়ে মণিপুর-রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

এক বৎসর বয়সের নাবালক পুত্র চন্দ্রকীর্ত্তিকে রেখে গম্ভীর-সিংহ হঠাৎ পরলোকগমন করলেন। শৈশবকাল থেকেই চন্দ্রকীর্ত্তির জীবনে দেখা দিলে নানা ভাগ্যবিপর্য্যয়। গম্ভীর-সিংহের সেনাপতি নরসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবেন্দ্রসিংহের

চক্রান্তের হাত থেকে নিজের এবং পুত্রের প্রাণ রক্ষা করবার জন্যে রাজমাতা বালক চন্দ্রকীর্ত্তিকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন ইংরেজ অধিকৃত কাছাড়-রাজ্যে।

দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে চন্দ্রকীর্ত্তি একদিন একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় মণিপুরে এসে উপস্থিত হলেন। তখন তিনি সবে প্রথম যৌবনে পা দিয়েছেন, দেহে তাঁর অমিত শক্তি, অন্তরে অদম্য উৎসাহ—মণিপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার স্বপ্নে তিনি মশ্‌গুল। প্রজাদের নিকট আত্মপরিচয় দিয়ে যখন তিনি তাদের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার জন্যে আহ্বান করলেন তখন তারা দলে দলে এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল—তাদের সহায়তায় তিনি হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হলেন।

চন্দ্রকীর্ত্তির শাসনভার গ্রহণের অব্যবহিত পরেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরে একজন পলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত করলেন, তাঁর অবস্থানের জন্যে ইম্ফলে স্থাপিত হল ব্রিটিশ রেসিডেন্সী। পরবর্ত্তীকালে মণিপুরে যে ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তার স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হয় এই রেসিডেন্সী থেকেই।

চন্দ্রকীর্ত্তির সুশাসনে মণিপুরীরা রামরাজ্যে বাস করত একথা বললে অত্যুক্তি হয় না। যে কয়জন নৃপতির শৌর্য্য-বীর্য্যের কাহিনী মণিপুরের ইতিহাসকে গৌরবমণ্ডিত করে রেখেছে চন্দ্রকীর্ত্তি তাঁদের অন্যতম।

মহাবীর টিকেন্দ্রজিৎ ও মণিপুরী-বিদ্রোহ

চন্দ্রকীর্ত্তি পঁয়ত্রিশ বৎসর প্রবল পরাক্রমে মণিপুরে রাজত্ব করেছিলেন। মৃত্যুর অনতিকাল পূর্ব্বে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত ও দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত কুলচন্দ্রকে যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত করে যান। চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যুর পর মহারাজ শূরচন্দ্র একটি দরবারের আয়োজন করে রাজ্যের ব্রাহ্মণসম্প্রদায় এবং পাত্রমিত্র সবাইকে আমন্ত্রণ করেন। দিনকতক পরে সেনাপতি ঝালকীর্ত্তির মৃত্যু হলে পর শূরচন্দ্র সর্ব্বসম্মতিক্রমে তৃতীয় ভ্রাতা টিকেন্দ্রজিৎকে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলেন। টিকেন্দ্র ছিলেন মহাবীর। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে বিদ্রোহী নাগাদের দমন করে তিনি ইংরেজদের মান ইজ্জৎ রক্ষা করেছিলেন!

টিকেন্দ্র সেনাপতির পদে নিযুক্ত হওয়াতে মণিপুরের সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অতুলনীয় বীরত্ব-প্রকাশ করে একে একে তিনি বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে লাগলেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভৈরবজিৎ (পাক্কাসেনার) তা সহ্য হল না। তিনি স্থুরু করলেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। এতে মণিপুররাজ্যে হিংসাদ্বেষ এবং আত্মকলহের সূত্রপাত হল।

এই সময় মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেণ্ট ছিলেন মিঃ গ্রিমউড। মিঃ এবং মিসেস গ্রিমউডের সঙ্গে টিকেন্দ্রজিতের খুব হৃদ্যতা জন্মেছিল। মিসেস গ্রিউড মণিপুর সম্বন্ধে তাঁর

স্মৃতিকথায় টিকেন্দ্রর দৈহিক শক্তিসামর্থ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন।

এদিকে টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে পাক্কাসেনার বিরোধ ক্রমশঃ বেড়েই চলতে লাগল। মহারাজ পাক্কাসেনার পক্ষাবলম্বন করলেন। ক্রমে ক্রমে রাজপরিবারে একটা বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে লাগল। অবশেষে আট জন রাজভ্রাতা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। একদিকে মহারাজা স্বয়ং, পাক্কাসেনা, সামু হেঙ্গেবা, এবং দলরাই হেঙ্গেবা এবং অন্যদিকে যুবরাজ, সেনাপতি, আঙ্গেয় সেনা এবং তরুণ রাজকুমার জিল্লা সিংহ।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে উভয় পক্ষের বিরোধ একেবারে চরমে উঠল। ১৮৯০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রে সমস্ত রাজপুরী যখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে মগ্ন তখন রাজকুমার জিল্লা সিংহ আর তাঁর ভাই আঙ্গেয় সেনা একদল অনুচর সহ রাজপুরীর পাঁচিল টপকে রাজপ্রাসাদে ঢুকে মহারাজের শয়ন-কক্ষ লক্ষ্য করে ক্রমাগত বন্দুকের গুলি বর্ষণ করতে লাগলেন। মহারাজা শূরচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির লোক। তিনি খিড়কির দ্বার দিয়ে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন। এই সময় টিকেন্দ্রজিৎ এসে জিল্লা সিং প্রভৃতির সঙ্গে যোগ দিলেন এবং কেল্লা, বারুদখানা প্রভৃতি দখল করলেন।

এদিকে রাত দু'টোর সময় মহারাজা পালিয়ে ব্রিটিশ রেসিডেন্সীতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা রেসিডেন্সীতে অবস্থান করবার পর মহারাজা, মিঃ

গ্রিমউডের ব্যবস্থামত গুর্খা সৈন্য পরিবৃত হয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করে কাছাড়ের পথে রওনা হলেন। (১২৮৯, ৫ই আশ্বিন)।

শূরচন্দ্র রাজ্য পরিত্যাগ করে চলে যাবার পর তাঁর ভ্রাতা কুলচন্দ্র রাজ-প্রতিনিধির (Regent) পদে অভিষিক্ত হলেন আর মণিপুরের প্রথা অনুযায়ী সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ লাভ করলেন যুবরাজের পদ। এখন রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিলে—এখন আর এ বিষয় কোনো সন্দেহ রইল না যে, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎই প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা।

এদিকে মহারাজা শূরচন্দ্র তখন কলকাতায় থেকে হৃত রাজ্য ফিরে পাবার আবেদন জানিয়ে আসামের চিফ কমিশনার কুইন্টন সাহেব এবং ভারত-সরকারের নিকট পত্র লিখলেন। বড় লাট লর্ড ল্যান্সডাউন টিকেন্দ্রজিৎকেই মণিপুরের সকল বিভ্রাটের মূল মনে করে রাজ্য থেকে কৌশলে নির্ব্বাসিত করবার মতলব আঁটলেন। তাঁর নির্দ্দেশে কুইন্টন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ্চ কর্ণেল স্কীনের অধীনে কয়েক শত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে গোলাঘাট থেকে মণিপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন। ২২শে মার্চ্চ সকালবেলায় কুইন্টন সদলবলে মণিপুরের ব্রিটিশ রেসিডেন্সীতে এসে পদার্পণ করলেন।

কুইন্টন মণিপুরে পৌঁছেই এক দরবারের আয়োজন করলেন; তাঁর আসল উদ্দেশ্য কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎকে দরবারে আমন্ত্রণ করে এনে, কৌশলে বন্দী করে কয়েক বৎসরের

জন্যে মাতৃভূমি থেকে নির্ব্বাসিত করা। দরবারের আয়োজন করে কুইন্টন রাজা এবং রাজভ্রাতাদের ডেকে পাঠালেন। টিকেন্দ্রজিৎ কিন্তু পূর্ব্বাহ্ণেই এই ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়েছিলেন, তাই তিনি নিজে না গিয়ে দূতমুখে সংবাদ পাঠালেন যে, অসুস্থতানিবন্ধন তিনি দরবারে হাজির হতে অসমর্থ। সুতরাং ২৩শে মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত দরবারের অধিবেশন স্থগিত রইল। ২৩শে তারিখ সকালে দরবারের পুনরধিবেশন হওয়ার কথা। বেলা আটটার সময় খবর এল যে যুবরাজ অত্যন্ত অসুস্থ, এবং সেজন্যে শুধু তাঁরই নয়, কুলচন্দ্রের পক্ষেও আসা সম্ভব হবে না।

টিকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করবার সকল কৌশল যখন ব্যর্থ হল তখন কুইন্টন রেসিডেন্সীর সামরিক কর্ম্মচারীদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির করলেন যে, অতর্কিতভাবে রাজপুরী আক্রমণ করে তাঁকে বন্দী করতে হবে। একদিন শেষরাত্রে লেফটেনাণ্ট ব্র্যাকেনবারী এবং কাপ্তেন বুচার প্রভৃতি কয়েকজন সেনানায়ক অনেক সৈন্যসামন্তসহ রাজপ্রাসাদের উপর চড়াও হলেন। কাপ্তেন বুচার পাঁচিল টপকে যুবরাজের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সমস্তই হল বৃথা পণ্ডশ্রম। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে নিজ পরিজনবর্গসহ টিকেন্দ্রজিৎ কি ভাবে যে অন্তর্ধান করলেন কাপ্তেন বুচার সে রহস্য কিছুতেই ভেদ করতে পারলেন না।

অকস্মাৎ মণিপুরের দুর্গে ঘোর রবে রণ-দামামা বেজে উঠল, মণিপুরী সৈন্যদের আকাশফাটা চীৎকারে কানে তালা

লাগবার যোগাড় হল। ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অতর্কিত আক্রমণের প্রতিশোধ নেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে এবার তারা অবিশ্রান্তভাবে ব্রিটিশ রেসিডেন্সীর উপর গোলাবর্ষণ সুরু করলে। গোলাগুলির আঘাতে রেসিডেন্সীর দরজা জানালা আর কাচের সার্সিগুলো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল, বিভিন্ন কক্ষে চলল ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা।

এদিকে সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। সাতটা বেজে গেল, তবুও গোলাবর্ষণের বিরাম নেই। রেসিডেন্সীতে ছিলেন একজন মাত্র ইংরেজ মহিলা। তিনি পলিটিক্যাল এজেণ্টের পত্নী মিসেস গ্রিমউড। নিরুপায় হয়ে অবশেষে ইংরেজরা মণিপুরীদের সঙ্গে সন্ধি করাই স্থির করলেন। রেসিডেন্সীতে যুদ্ধবিরতির বিউগল বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই মহানুভব টিকেন্দ্রজিতের হুকুমে মণিপুরীরা গোলাবর্ষণে ক্ষান্ত হল। রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময় চিফ কমিশনার কুইণ্টন, কর্ণেল স্কীনে, কলিন্স, লেঃ সিম্পসন এবং মিঃ গ্রিমউড এই পাঁচ জন ইংরেজ সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে রাজপ্রাসাদে টিকেন্দ্রজিতের নিকট গিয়ে হাজির হলেন। যুবরাজ তাঁদের বললেন যে, ইংরেজরা যদি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হন তা হলেই শুধু সন্ধি হতে পারে। গ্রিমউড এবং তাঁর সঙ্গীরা এ প্রস্তাবে সম্মত হতে না পেরে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করবার উপক্রম করলেন। যুবরাজও চিন্তাকুল মনে অন্যদিকে রওনা হলেন।

যুবরাজ দৃষ্টির বহির্ভূত হবামাত্রই অকস্মাৎ রুদ্ধ হল

রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার। প্রতিশোধ-কামনায় ক্ষিপ্তপ্রায় মণিপুরীরা সাহেবদের ঘিরে ফেলে এলোপাথাড়ি মার দিতে লাগল। এক মণিপুরীর তীক্ষ্ণধার বর্শার আঘাতে মিঃ গ্রিমউড নিমেষ-মধ্যেই পঞ্চত্বলাভ করলেন। যুবরাজ এ সময়ে ছিলেন স্থানান্তরে। মণিপুরের আবালবৃদ্ধবনিতা যাঁর নামে আতঙ্কে শিউরে উঠত সেই অশীতিবর্ষবয়স্ক বৃদ্ধ থঙ্গাল জেনারেল তখন ছিলেন তোপখানায় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। হঠাৎ উত্তেজিতভাবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সাগন্নেসবা ধনসিং নামক ঘাতককে হুকুম দিলেন বাকী চারজন ইংরেজের মুণ্ডচ্ছেদ করতে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হল এবং পাঁচটি মুণ্ড একত্রে একটি খাদে পুঁতে মণিপুরীরা তাদের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করলে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর আবার মণিপুরীরা রেসিডেন্সীর চারিদিক বেষ্টন করে কামান দাগতে লাগল।

রাত তখন দুটো; বাইরে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলছে। এই ধ্বংসলীলার মধ্যেই মিসেস গ্রিমউড এবং রেসিডেন্সীর অন্যান্য ইংরেজগণ পথে এসে দাঁড়ালেন। মিসেস গ্রিমউডের ঠিক পায়ের কাছেই একটি বোমা ফাটল। রেসিডেন্সী ছাড়িয়ে, একটি নদী পার হয়ে তাঁরা সন্তর্পণে কাছাড়ের রাস্তা ধরে চলতে লাগলেন এবং নানা বিপদ আপদ অতিক্রম করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা পথশ্রমে মৃতপ্রায় অবস্থায় শিলচরে এসে উপস্থিত হলেন।

কাছাড়, কোহিমা, টামু প্রভৃতি স্থানে যে সকল ইংরেজ কর্ম্মচারী ছিলেন তাঁদের কাছে অনতিবিলম্বে মণিপুরের দুঃসংবাদ

গিয়ে পৌছল, টামু সমর-শিবিরের অধিনায়ক লেঃ গ্রাণ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ মণিপুরের দিকে রওনা হলেন। অচিরেই কুইণ্টন প্রভৃতির শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের সংবাদ সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মণিপুরীদের উপর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলেন। পালেল নামক স্থানে মণিপুরীদের আক্রমণ প্রতিহত করে গ্রাণ্ট অগ্রসর হতে লাগলেন এবং ইম্ফলের চৌদ্দ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে থোবালে পোঁছে সেখানকার একটি দুর্গ দখল করলেন। এদিকে মণিপুরের স্বাধীনতালোপের জন্যে সুরু হল বিপুল আয়োজন। কাছাড়, কোহিমা, টামু এই তিন দিক দিয়েই পঙ্গপালের মত বিপুল ব্রিটিশ বাহিনী মণিপুরে প্রবেশ করতে লাগল। মেজর কলেট মণিপুর-যুদ্ধের অধিনায়কের পদে বৃত হয়ে ২০শে এপ্রিল সসৈন্যে কোহিমা থেকে মণিপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন। ২৫শে তারিখে পালেলের প্রচণ্ড যুদ্ধে অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত মণিপুরীরা পরাস্ত হল। জেনারেল কলেট বীরদর্পে মণিপুরে পোঁছে রাজধানী দখল করলেন, কিন্তু রাজধানীতে তখন জনপ্রাণী নেই, চারিদিকে ভয়াবহ মহাশ্মশানের নিস্তব্ধতা, যে যেদিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে গেছে। মহারাজা স্বয়ং, যুবরাজ টিকেন্দ্রজিৎ সকলেই পলাতক। পরিত্যক্ত শূন্য রাজপুরীতে ব্রিটিশের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হল। কলেট ঘোষণা করলেন—মণিপুররাজ্যে আর কেউ বন্দুক তরবারি প্রভৃতি নিজের অধিকারে রাখতে পারবে না, আর যারা মহারাজা,

দেশের মুক্তিকল্পে স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। আমরা সকল ক্ষেত্রে তাদের তেমন ভাবে ডাক দিই নি, কিন্তু এ দেশের কল্যাণেই যে তাদের প্রকৃত কল্যাণ সে বোধ তাদের মনে পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত হয়েছিল বলেই তারা সেদিন হাসিমুখে সকল দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন বরণ করে নিতে পেরেছিল।

১৯৩৯ সালে উড়িষ্যার গাঙ্গপুর রাজ্যে সুরু হল প্রবল প্রজা আন্দোলন। আদিবাসীরাও এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে খাজানা দেওয়া বন্ধ করলে। গাঙ্গপুরের রাণী সাহেবা খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আন্দোলন বন্ধ করবার চেষ্টা করেন।

এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নির্ম্মল মুণ্ডা নামক জনৈক আদিবাসী। তাঁর নির্দ্দেশে মুণ্ডারা পুরোদমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। কিছুদিন পরেই নেতাদের ধরবার জন্যে দরবার কর্ত্তৃক প্রেরিত একদল সৈন্য দহিজিরা নামক একটি মুণ্ডাগ্রাম ঘেরাও করে। কয়েকজন নেতা ধরা পড়েন, কিন্তু নির্ম্মল মুণ্ডা রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান হন এবং পুলিশের সতর্ক-দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠন-কার্য্য চালাতে থাকেন। নির্ম্মল মুণ্ডার আশ্চর্য্য সংগঠন-শক্তির দরুন মুণ্ডারা এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয় যে, কোনো সরকারী কর্ম্মচারী কিংবা পুলিশ গ্রামে এলেই দামামা বাজানো হ'ত আর সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসীরা তীর ধনুক ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। একবার নির্ম্মল মুণ্ডা নিজে একটি টাঙ্গি নিয়ে একজন চৌকিদারকে তাড়া করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করবার সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল তখন দরবার ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট সৈন্যবাহিনী প্রেরণের জন্যে

অনুরোধ করেন, তদনুসারে জনৈক ব্রিটিশ সামরিক কর্ম্মচারীর অধীনে মুণ্ডাদের এলাকায় পঞ্চাশ জন সৈন্য পাঠানো হয়। সামরিক কর্ম্মচারীরা নির্ম্মল মুণ্ডাকে গ্রেফ্তার করবার উদ্দেশ্যে এই সৈন্যদল ও পুলিশবাহিনীসহ একটি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন। এদের বাধা দেবার জন্যে এক জনতা লাঠি ও কুঠার ইত্যাদি সহ অগ্রসর হয়। পুলিশ বেমালুম গুলি চালাতে থাকে, ফলে অকুস্থলে ৩২ জন মুণ্ডা নিহত হয়। শেষে নির্ম্মল মুণ্ডাকে ঘর থেকে বের করে এনে গ্রেফ্তার করা হয়।

ভারতের দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই আন্দোলনে নেতা নির্ম্মল মুণ্ডা যে কর্ম্মক্ষমতা ও সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর।

আগষ্ট আন্দোলন ও আদিবাসী

যে দামিন কো এলাকায় একদা সাঁওতালরা ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেছিল সেই অঞ্চলেই ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময় সাঁওতাল এবং পাহাড়িয়ারা প্রফুল্লচন্দ্র পট্টনায়কের নেতৃত্বে যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছে সে কাহিনীও মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

দামিন এলাকায় প্রত্যেক তিন মাইল পর পর একটি করে বাংলো আছে। এই বাংলোগুলি একাধারে থানা কাছারি এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের আস্তানা। পট্টনায়কের নেতৃত্বে

বাঙালীদের সংস্রবে থেকে অনেক সাঁওতালী পুরুষ পোষাক-পরিচ্ছদে কতকটা বাঙালীদের অনুকরণ করেছে, কিন্তু যারা তথাকথিত সভ্যসমাজের সংস্পর্শ থেকে দূরে আছে তারা নেংটি পরে এবং একটা মোটা চাদরে শরীর ঢেকে রাখে।

সাঁওতালদের কতকগুলি সুন্দর সুন্দর সামাজিক অনুষ্ঠান আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে চাচো ছেটিয়ের। এই উৎসবের সময় সকলে প্রচুর পরিমাণে হাড়িয়া পান করে ও নাচ-গানের ধুম পড়ে যায়। শেষে সুরু হয় বিন্তিকথা বা ধর্ম্মকথা—বুড়োরা ছেলেছোক্‌রাদের কাছে পৃথিবীর জন্মকথা, সাঁওতালদের বংশবিস্তারের কাহিনী ইত্যাদি বর্ণনা করে। গল্প বলা শেষ হলে সবাইকে সম্বোধন করে একজন বলে—"আপে মঁড়ে হড় ঠেনলে নেঁহরঃ কানা, কেঁহু নেকালে তাঁহে কানা বাঁবা লেকালে পংএনা আদ আপ মঁড়ে হড়গে গোহা তাহেন পে।" অর্থাৎ—"আপনাদের পাঁচ জনের নিকট এই নিবেদন করছি—আমরা কাকের মত ছিলাম, বকের মত সাদা হলাম, আপনারা পাঁচ জনে সাক্ষী থাকুন।" অতঃপর কিছুক্ষণ নৃত্যগীত ও হাড়িয়া পান চলবার পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সাঁওতালরা বিবাহকে বলে বাপলা। এদের সমাজেও ঘটক (রায়বারই) আছে, তারা অভিভাবকদের পাত্র-পাত্রীর সন্ধান দেয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কুমার-কুমারীদের নিজেদের ইচ্ছানুসারেই বিয়ে হয়ে থাকে। ঘটকের আনা প্রস্তাবে সম্মতি থাকলে প্রথমে কন্যাপক্ষের লোক গিয়ে হবু জামাতার বাড়ীঘর

ইত্যাদি দেখে আসে, তারপর 'হরক চিখনে' (পাকা দেখা) হয়। বরের পিতা একদিন আত্মীয়কুটুম্বসহ কনের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হয়। কনে সেবাপরিচর্য্যাদি দ্বারা বরপক্ষের লোকেদের তৃপ্তিবিধান করে। খাওয়া-দাওয়ার পর বরের বাপ বধূর গলায় একটি হাঁসুলি পরিয়ে দেয়। তারপর "টাকাচাল" অর্থাৎ পণের টাকা আদান-প্রদান ও বিয়ের দিন স্থির করা হয়। বিয়ের সময় উভয় পক্ষের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করে; নৃত্যগীতের ধুম পড়ে যায়। শেষে সুরু হয় দুই পক্ষের মাঝিদের মধ্যে বিস্তিকথা। কনের পক্ষের মাঝি বরপক্ষের মাঝিকে লক্ষ্য করে কিছু উপদেশ বর্ষণ করে। কন্যাপক্ষের মাঝি তার কথা মেনে নেয়, তারপর কনের হাত ধরে বরপক্ষের মাঝির নিকট নিয়ে গিয়ে বলে "নি বাবা হড়ইং সপ্রতাপে কনে।" অর্থাৎ—'নাও বাবা, বধূকে তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি।" বরপক্ষের মাঝি জবাব দেয়, "হেঁ বাবা এতাম্ কেদালে"। ('হাঁ বাবা, আমরা পেলাম।') এই সমস্ত অনুষ্ঠানের পর কনেকে তার শ্বশুরালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

সাঁওতালদের প্রধান দেবতা হচ্ছেন সিংবোঙ্গা (সূর্য্যদেব) —এরা নানা উপচারে তাঁর পূজা করে থাকে। সিং-বোঙ্গার পরেই মারাং বুরুর (বড় পর্ব্বত) স্থান। এ ছাড়া আরো অনেক দেবতাকে এরা মানে। যথা—চাম সিম্‌বোঙ্গা, মঁড়ে তুরুই, গোঁসাই প্রভৃতি। এদের নানাপ্রকার পরব আছে।

সাঁওতালরা ভূতপ্রেত, উপদেবতা ডাকিনী প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। স্ত্রীলোকেরা ডাকিনীবিদ্যা শিখে ডাইনী হয়। ডাইনীরা যার উপর নজর দেয় সে নাকি তিল তিল করে শুকিয়ে মারা যায়।

সাঁওতালরা মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে মৃতের অস্থি নদীতে নিক্ষেপ করে। 'ভাণ্ডান' উদ্‌যাপিত হলে পর এরা অশৌচমুক্ত হয়। ভাণ্ডান হচ্ছে শ্রাদ্ধের ন্যায় একপ্রকার অনুষ্ঠান। এতদুপলক্ষে মৃতের বাড়ীতে গ্রামবাসীদের পান-ভোজনের ব্যবস্থা হয়। ভাণ্ডান না হওয়া পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে পর্ব্বাদি অনুষ্ঠিত হতে পারে না।

পাহাড়িয়া

বাংলাদেশে পাহাড়িয়া নামক আদিবাসীদের দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সাঁওতাল পরগণার পার্ব্বত্য অঞ্চলেই প্রধানতঃ এদের বাস। এদের আদি বাসস্থান ছিল সাঁওতাল পরগণার দামিন এলাকায়, কিন্তু সাঁওতালরা এদের সমতল থেকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিতাড়িত করে এবং নিজেরা সমতলে বসতি স্থাপন করে। সেই থেকে পাহাড়িয়াদের সঙ্গে সাঁওতালদের বিরোধ চলে আসছে।

পাহাড়িয়ারা তিনটি শাখায় বিভক্ত—মাল পাহাড়িয়া, সৌরিয়া পাহাড়িয়া আর কুমর পাহাড়িয়া। বাংলাদেশে অনেক মাল পাহাড়িয়ার বাস। কুমর পাহাড়িয়া আর মাল

পাহাড়িয়ারা কতকটা সভ্য হয়েছে, সৌরিয়াদের আদিম রীতিনীতির কিন্তু বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নি।

জঙ্গলের লকড়ি আর গাছগাছড়ার শিকড় বিক্রী করে এবং শিকার দ্বারা এরা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পাহাড়ের ঢালুতে এরা ক্ষেতকৃষি করে। এই কৃষিকে এরা বলে কুরুয়া।

ওরাওঁ

রাঁচি জেলার আদিম জাতিসমূহের মধ্যে ওরাওঁ এবং মুণ্ডারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই জেলার বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা ৫৫ জনই হচ্ছে এই দুই শ্রেণীর আদিবাসী। বাংলাদেশে ওরাওঁ জাতির লোকসংখ্যা ৬,৩৮,৪৯০ জন, তন্মধ্যে জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুরে ২,২৮,০৬১ জন ওরাওঁ বাস করে।

ওরাওঁরা মুখ্যতঃ কৃষিজীবী, মজুরের কাজেও এদের বেশ পটুত্ব আছে। আসামের চা-বাগানসমূহে ওরাওঁ মজুরের চাহিদা খুব বেশী। এক হাজারেরও বেশী ওরাওঁ পরিবার আসামের চা-বাগানগুলিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে, ওরাওঁরা পাহাড় এবং সমতল উভয় অঞ্চলেই বাস করে।

ওরাওঁ পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্রের নাম কইরা, এগুলি লম্বায় দু' গজ আর প্রস্থে দু' ফুট মাত্র। এরা ক্ষেতে খালি গায়ে কাজ করে, অন্য সময় হাতে-কাটা সুতোয় তৈরি চাদর দিয়ে শরীর ঢেকে রাখে—এই গাত্রাবরণকে বলে বারকি। ইদানীং শিক্ষিত ওরাওঁরা বাঙালীদের ন্যায় ধুতি কোর্ত্তা ইত্যাদি পরিধান করে থাকেন। ভাতই ওরাওঁদের প্রধান খাদ্য।

বিবাহ এবং পর্ব্বাদি উপলক্ষ্যে এরা শূকর এবং গরু ছাগল ইত্যাদির মাংস খেয়ে থাকে। ভাত পচিয়ে এরা 'হাড়িয়া' নামে একপ্রকার মদ তৈরি করে।

ওরাওঁরা প্রায় ৪টি কিল্লি বা গোত্রে বিভক্ত। যথা—বাঁদর কিল্লি, ইঁদুর কিল্লি, সিংহ কিল্লি, বাঘ কিল্লি ইত্যাদি। এদের সমাজে স্বগোত্র-বিবাহ নিষিদ্ধ। বিয়েতে কন্যাপক্ষকে বরপক্ষের মোটা টাকা পণ দিতে হয় এবং বিয়েতে যৌতুকস্বরূপ যে সমস্ত জিনিষ দিতে হয়, ক্ষেত্রবিশেষে তার মূল্য দাঁড়ায় ৫০০৲ থেকে ৬০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। বিয়ে হয় কনের বাড়ীতে নবনির্ম্মিত একটি মণ্ডপে। কনেকে সিন্দুরদান—বিবাহের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। বিয়েতে মাঙ্গল্য দ্রব্য-স্বরূপ প্রচুর হলুদ ব্যবহৃত হয়। কনের বাড়ীতে বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার দুই দিন পরে কন্যাপক্ষের স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলে বরের বাড়ীতে যায়।

মৃতদেহকে এরা দাহ করে এবং ভস্মাবশেষ 'শশান্দ্রিতে' (শ্মশানভূমি) মাটির নীচে পুঁতে ফেলে। কারুর অপমৃত্যু হলে ওরাওঁরা তার মৃতদেহ না পুড়িয়ে নদীর তীরে গোর দেয়।

প্রত্যেক গ্রামে ওরাওঁরা একটি বনঝোপ সযত্নে রক্ষা করে এবং সেটির ছায়াতলে দেবতার পূজা দেয়। এই দেবস্থানকে এরা বলে সার্ণা। সার্ণার গাছপালা অতি পবিত্র বলে বিবেচিত হয় এবং এরা কখনো সেগুলির ডালপালা কাটে না। প্রত্যেক গ্রামে একজন করে পাহান

বা পুরোহিত থাকে, পূজাপার্ব্বণ এই পাহানের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম যে-পরিবার এসে গ্রাম পত্তন করেছিল, পাহানের পদ সেই পরিবারের লোকেরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। পাহান সারা গ্রামের পক্ষে পূজানুষ্ঠান করে। প্রত্যেক পূজাপার্ব্বণে মোরগ বলি দেওয়া হয় এবং প্রচুর পরিমাণে হাড়িয়ার সদ্ব্যবহার করা হয়। কর্ম্ম, সারহুল ফাগুর, দেওয়ালি এবং রাজকর্ম্মা এগুলি এদের প্রধান উৎসব।

ওরাওঁরা গোষ্ঠীবদ্ধ জাতি। প্রত্যেক গ্রামে এক জন করে পাহান এবং মাহাতো আছে। পাহান হচ্ছে পুরোহিত আর মাহাতো সমাজ-পরিচালক। ওরাওঁদের মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে প্রচলিত:—'পাহান গাঁও বানাতা হ্যায়, মাহাতো গাঁও চালাতা হ্যায়।' অর্থাৎ, পাহান গ্রাম বানায় আর মাহাতো গ্রাম চালায়।

ভূতপ্রেত এবং উপদেবতাকে ওরাওঁদের বড় ভয়। রোগশোক আধিব্যাধি ইত্যাদি উপদেবতাদের কোপে সংঘটিত হয় বলে এদের বিশ্বাস। মোরগ, ছাগল অথবা মোষ বলি দিয়ে এদের তুষ্ট করবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি উপদেবতাদের রাগ না পড়ে এবং আধিব্যাধি বেড়ে চলতেই থাকে তা হলে ওরাওঁরা নিজেদের বাস্তু ত্যাগ করে অন্য কোনো গ্রামে চলে গিয়ে নূতন করে ঘর বাঁধে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের উপদেশে, এই সমস্ত ভূতপ্রেতের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই শুধু বহু ওঁরাও খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেছে।

লেখাপড়ার দিকে ওরাওঁদের খুব ঝোঁক আছে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা প্রায় পঁচাত্তর বৎসর যাবৎ এদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার করে আসছেন। তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রায় তিন লক্ষেরও অধিক ওরাওঁ খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে। রাঁচি জেলার খ্রীষ্টান ওরাওঁদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ পঞ্চাশ জন শিক্ষিত। খ্রীষ্টান ওরাওঁ মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯ জন শিক্ষিতা। ওরাওঁদের মধ্যে অন্ততঃ ২৫ জন গ্রাজুয়েট আছেন। দু'টি ওরাওঁ বালিকা কলেজে পড়ছে। একজন ওরাওঁ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত আছেন।

টানা ভগৎ আন্দোলন

ওরাওঁদের মধ্যে সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলন অনেক হয়েছে। জাতির নানা কুসংস্কার দূর করবার জন্যে ওরাওঁদের একটি বিশেষ সম্প্রদায় বহুদিন যাবৎ চেষ্টা করে আসছে। তারা সাধারণভাবে ভগৎ নামে পরিচিত। এই ভগৎদের মধ্যে টানা ভগৎ সম্প্রদায়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। টানা ভগৎ আন্দোলনের প্রবর্ত্তকের নাম যাত্রা ভগৎ। ১৯১৪ সালে, যাত্রা ওরাওঁ যখন মাত্র পঁচিশ বৎসরের যুবক তখন একদিন তিনি প্রচার করেন যে, ওরাওঁদের প্রধান দেবতা ধর্ম্মেশ তাঁকে স্বপ্নে আদেশ দিয়ে গেছেন যে, ওরাওঁদের উপদেবতার পূজা ত্যাগ করাতে হবে, পশুবলি মাংসাহার মদ্যপান ইত্যাদি আর চলবে না, এমন কি চাষবাস থেকেও তাদের বিরত থাকতে হবে।

জাতি বাস করে। ধর্ম্মে এরা বৌদ্ধ এবং এদের ভাষাও প্রায় বাংলা ভাষার মত। অতীতে এই চাকমারা বাংলাদেশে আসে আরাকানের চিন পাহাড় থেকে। ত্রিপুরার কুকিরাও এসেছিল এই অঞ্চল থেকেই।

উপরিউক্ত জাতিগুলি ছাড়া ভোটব্রহ্ম শাখার গারো, কাছাড়ী, মেচ, রাভা হাজং প্রভৃতিও বাংলাদেশে আগন্তুক উপজাতি।

ময়মনসিংহ জেলার সেরপুর ও সুসঙ্গ পরগণার প্রায় ৩৫ হাজারের কাছাকাছি গারো এসে স্থান করে নিয়েছে। তা'ছাড়া এ দু'টো স্থানে হাড়ী, কোচ এবং হাজংও বহুসংখ্যক আছে।

১৯৪১ সালের আদমসুমারি অনুসারে বাংলাদেশে ২১টি বিভিন্ন শ্রেণীর আদিবাসী আছে। যথা—ভুটিয়া, চাকমা, দামাই, গুরুঙ্গা, হাড়ী, কামী, থারিয়া, খাস, কুকি, লেপচা, লিমু, মঙ্গের, মেচ, মিরু, মুণ্ডা, নেওয়ার, ওরাওঁ, সাঁওতাল, সড়কি, সুনুওয়ার, টিপরা।

অবশ্য এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে। বাংলাদেশে এমন কতকগুলি উপজাতি আছে যাদের এই তালিকায় ধরা হয় নি। যাই হোক্, বাংলার সবগুলি উপজাতি সম্বন্ধে আলোচনা এখানে করা সম্ভব নয়। পূর্ব্বে একটি অধ্যায়ে বিহারের আদিবাসীদের প্রসঙ্গে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, হো প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেছি। এবার বাংলাদেশে উপরিউক্ত জাতিসমূহের যে সকল লোক বাস করে তাদের আচার-ব্যবহার রীতিনীতির কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করব।

সাঁওতাল

অতীতে উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুর থেকে সাঁওতালরা বাংলাদেশে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। বর্ত্তমানে সাঁওতালদের উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলায় দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে যে সমস্ত আদিবাসী আছে তন্মধ্যে সাঁওতালদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ১৯৪১ সালের আদমসুমারি অনুসারে এদের লোকসংখ্যা ৮, ২৯, ০ ২৫ জন। এরা চাষবাসকেই জীবিকার প্রধান উপায়রূপে গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে বাঙালী হিন্দুর ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব কিছু কিছু পড়লেও এরা নিজেদের ভাষা এবং জাতীয় আচার-ব্যবহার আঁকড়ে ধরে আছে। বাংলাদেশের এক বিপুল জনসমষ্টি সাঁওতালী ভাষায় কথা বলে, সেজন্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাঁওতালী ভাষাকে পাঠ্যতালিকায় স্থান দিয়েছেন। সাঁওতালদের রূপকথা এবং গান ও গীতি-কবিতাগুলি ভারি সুন্দর। অবশ্য এদের নিজস্ব কোনো লিপি নেই।

আগেকার দিনে সাঁওতালরা ছিল যাযাবর জাতি। সুদূর অতীতে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যখন এরা দেখলে যে, ছোটনাগপুর এবং তার আশপাশের জায়গাগুলি বসবাসের উপযোগী তখন উক্ত অঞ্চলে জঙ্গল কেটে ঘর বাঁধলে—তারপর আস্তে আস্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

সাঁওতালদের উচ্চতা মাঝারি, গায়ের রং মিশকালো, শরীর

দেখতে দেখতে এই আন্দোলন ওরাওঁদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। কোনো কোনো জায়গায় এই সম্প্রদায়ের লোকেরা চাষবাস পর্য্যন্ত ছেড়ে দিলে। তাদের নীতি হল নিজেদের সমাজে যত কুসংস্কার আছে সব টেনে ফেলে দেওয়া। সেই জন্যে তাদের গান হল নিম্নলিখিত রূপ :—

টানা বাবা টানা ভূতানিকে টানা
টানা বাবা টানা টান টোন টানা
......ইত্যাদি

অর্থাৎ, টান বাবা ভূতেদের টানো......

জমিদার এবং মহাজনশ্রেণীর লোকেরা এই আন্দোলনের শক্তি এবং প্রসার দেখে রীতিমত ভয় পেয়ে যায় এবং পুলিশের সাহায্যে একে দমন করবার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করে, কিন্তু চূড়ান্ত জুলুমজবরদস্তি করেও তারা সফলকাম হতে পারে নি। ধীরে ধীরে গ্রামের যুবকদের মধ্যে এই আন্দোলন দৃঢ়তরভাবে শিকড় গেড়ে বসতে থাকে।

কয়েক বছর পরে গান্ধীজীর অহিংসার আদর্শ এদের বিশেষ-প্রভাবিত করে এবং মনেপ্রাণে এরা গান্ধীপন্থী হয়ে যায়। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় অনেককে কারাবরণ করতে হয়। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় টানা ভগৎরা চৌকিদারী খাজানা দেওয়া বন্ধ করে। এই অপরাধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এদের সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ফেলেন, ফলে এরা একেবারে পথের ভিখারী হয়ে যায়।

মুণ্ডা (কোল)

মুণ্ডাদের লোকসংখ্যা ৫, ১৯, ৭৪৩ জন। এদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি সবই প্রায় ওরাওঁদের অনুরূপ। বাংলাদেশে ২৪ পরগণা ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রধানতঃ এদের দেখতে পাওয়া যায়। মুণ্ডা বা কোল হচ্ছে একই জাতি। আগেকার দিনে এদের মধ্যে যে পরিবার প্রথম গ্রাম পত্তন করত সেই পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা বর্ষীয়ান ব্যক্তির শাসন সকলে মেনে নিত। মুণ্ড মানে শীর্ষস্থানীয়। ঐ ব্যক্তি সমাজের মাথাস্বরূপ। এ থেকেই কোল জাতির নাম হয়েছে মুণ্ডা।

প্রত্যেক মুণ্ডা গ্রামে এক একটি আখড়া আছে। উৎসবের সময় অথবা কখনো কখনো দিনের কাজের শেষে গাঁয়ের স্ত্রী-পুরুষ এক খণ্ড পরিষ্কার জমিতে মাদলের তালে তালে একত্রে নাচ-গান করে—এই স্থানটিকে এরা বলে আখড়া। প্রত্যেক পাড়ার আখড়ার পতাকায় আলাদা চিহ্ন থাকে। এক পাড়ার পতাকার চিহ্ন অন্য পাড়ার লোকেরা ব্যবহার করলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা এমন কি খুন-জখম পর্য্যন্ত হয়।

রাঁচি জেলায় মুণ্ডা এবং ওরাওঁদের মধ্যে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে মাণ্ডা পরব নামে একটি উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এ অনেকটা আমাদের চড়কের গাজনের মত। মুণ্ডাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি ভোক্তা বা গাজনের সন্ন্যাসী হয় তাদের উপর নাকি মহাদেবের ভর হয়। এই উপলক্ষে ফুলকুদনা নামে একটি অনুষ্ঠান হয়। অনেকটা জায়গাজোড়া গনগনে

আগুনের উপর পুরোহিত খানিকটা মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দেন আর ভোক্তারা সেই আগুনের উপর দিয়ে অবলীলাক্রমে হেঁটে চলে যায়, তাদের পায়ে ফোস্কা পড়ে না।

হো

প্রধানতঃ সিংভূম জেলায় হোদের বাস, বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। এদের লোক-সংখ্যা ৩,৪২,৬৪৫ জন। এদের পোষাক-পরিচ্ছদ আহার-বিহার অনেকটা ওরাওঁদেরই অনুরূপ।

এদের জ্ঞাতি ওরাওঁ এবং মুণ্ডাদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচার হয়েছে যথেষ্ট, কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারকেরা সেখানে সুবিধা করতে পারেন নি। সিংভূম ও মানভূম জেলায় কয়েক শত হো কিন্তু ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে।

হোরা লড়ুয়ে জাত। খ্রীষ্টান মিশনারীরা প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র কয়েক শতের বেশী হোকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন নি। শিক্ষার প্রতি হোদের অনুরাগ দিন দিনই বাড়ছে। ইদানীং এদের মধ্যে প্রায় ছয় জন গ্রাজুয়েট ও কলেজে পড়ুয়া ৪০ জন ছাত্র আছে।

আদিবাসীদের বিদ্রোহ
ও
মুক্তি-সংগ্রাম

সিপাহী-বিদ্রোহের কথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সগৌরবে স্থান পেয়েছে। ইংরেজ রাজশক্তিকে উৎখাত করবার জন্যে ভারতীয় সিপাহীরা যে একদা সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল তা নিয়ে আমরা রীতিমত গর্ব্ব অনুভব করে থাকি। কিন্তু তারও প্রায় আটাশ বৎসর আগে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আসামের অন্যতম আদিবাসী খাসিয়াদের অভ্যুত্থান হয়েছিল। দুঃখের বিষয় আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে সে কাহিনী আজও যোগ্য মর্য্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয় নি।

শুধু খাসিয়ারাই নয়, ভারতের অন্যান্য কোনো কোনো আদিম জাতির লোকেরাও ব্রিটিশ শাসনকে নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে পারে নি। ব্রিটিশের অত্যাচার-উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে তারা বার বার রুখে দাঁড়িয়েছে। ফলে ভারতের আদিবাসী-অধ্যুষিত বিভিন্ন অঞ্চলে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড সমরানল এবং তা নির্ব্বাপিত করতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কম বেগ পেতে হয় নি। আসামে খাসিয়া ছাড়া, নাগারা রাণী গাইডিলিউর নেতৃত্বে করেছে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সিংভূমের কোলহান অঞ্চলের হো, রাজমহলের মাল পাহাড়িয়া এবং দামিন কো অঞ্চলের সাঁওতাল প্রভৃতি

আদিবাসীরা ইংরেজের অত্যাচার প্রতিরোধ করবার জন্যে সশস্ত্র ব্রিটিশ সৈন্যদের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছে—ওদিকে অন্ধ্রদেশের এজেন্সি অঞ্চলের কোণ্ডা ডোরা নামক আদিবাসীরা আল্লুড়ি শ্রীরামরাজার (সীতারাম রাজুর) নেতৃত্বে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে হেনেছে প্রচণ্ড আঘাত।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনেও আদিবাসীরা অংশ গ্রহণ করেছে। অহিংস অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলন এবং আগষ্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে তারা অপরিসীম বীরত্ব ও দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছে, কারাবরণ করেছে, এমন কি পুলিশের গুলিতে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। তীর্‌ত সিং, রাণী গাইডিলিউ, ভারতে প্রথম করবন্ধ আন্দোলনের প্রবর্ত্তক বীরসা ভগবান, মুণ্ডা, নেতা নির্ম্মল কাছাড়ী নেতা মধুবন, ভীল জননায়ক মোতীলাল তেজাবৎ, আগষ্ট আন্দোলনের সময় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আসামের কমলা মিরি প্রভৃতির ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং বীরত্বের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবার যোগ্য। এ সমস্ত কাহিনী বাদ দিয়ে তো ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ইতিহাস রচিত হতে পারে না।

আসামের আদিবাসীদের মুক্তি-সংগ্রাম

তীরত সিং ও খাসিয়া-বিদ্রোহ

খাসিয়ারা বীর সাহসী এবং স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। পরবশ্যতার প্রতি ঘৃণা খাসিয়াদের মজ্জাগত। এই পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তীরত সিং নামে এমন এক বীর যোদ্ধা ও দেশপ্রেমিক, যিনি নিজের মাতৃভূমি থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করবার উদ্দেশ্যে স্বজাতিদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আসামে প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্জলিত করেছিলেন। এই বিদ্রোহী জননায়ক সেদিন যে সামরিক প্রতিভা, সংগঠনশক্তি ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা নেই। তীরত সিং-এর সম-কালে তাঁর সমকক্ষ স্বদেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধা যে আসামে আর দ্বিতীয়টি ছিল না, সেকথা তাঁর প্রতিপক্ষদের মধ্যেও কেউ কেউ মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

তীরত সিং ছিলেন খাসিয়া পাহাড়ের নংক্লৌ রাজ্যের 'সিম' বা সামন্ত-রাজা। তিনি যে ব্যাপক বিদ্রোহের আয়োজন করেছিলেন তার ফলে আসামে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের টনক নড়ে উঠেছিল। এই বিদ্রোহ-প্রচেষ্টা ১৮২৯-৩৩ এই চার বৎসর কাল স্থায়ী হয়েছিল।

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আসাম ইংরেজদের হস্তগত হল। আসামের প্রথম ব্রিটিশ এজেণ্ট মিঃ স্কট ছিলেন অত্যন্ত কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন লোক। তিনি ইংরেজের স্বার্থে স্থলপথে- খাসিয়া

পাহাড়ের ভিতর দিয়ে, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সঙ্গে সুরমা উপত্যকার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন। গৌহাটির নিকটবর্ত্তী রাণী নামক স্থান থেকে চেরাপুঞ্জী এবং থারিয়াঘাটের ভেতর দিয়ে শ্রীহট্টের ভোলাগঞ্জ পর্য্যন্ত এক প্রকাণ্ড রাজপথ নির্ম্মাণের সঙ্কল্প তাঁর মনে উদিত হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে নংক্লৌয়ের সিম তীরত সিং-এর সঙ্গে মিঃ স্কটের এক চুক্তি হল। তদনুসারে তীরত সিং নিজ-রাজ্যকে ব্রিটিশের রক্ষণ-ব্যবস্থার অধীনে স্থাপন করলেন। তিনি নিজ অধিকারভুক্ত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের রাস্তা নির্ম্মাণের অনুমতি তো দিলেনই, উপরন্তু এরূপ প্রতিশ্রুতিও প্রদান করলেন যে, তিনি পথ নির্ম্মাণের মাল-মশলা দিয়ে সাহায্য করবেন। সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা পরিষ্কারের কাজ সুরু হয়ে গেল এবং নংক্লৌয়ে একটি বাংলো তৈরি হল।

নবনির্ম্মিত রাজপথের বুকের উপর নূতন দৃশ্যের অবতারণা হল।

রাজপথের উপর দিয়ে দিন-রাত ইংরেজ সৈন্যদের চলাচলের আর বিরাম নেই। কুচকাওয়াজ করে যখন তারা বীরদর্পে পথ অতিক্রম করতে থাকে তখন খাসিয়াদের বুঝতে বাকী থাকে না যে, ব্রিটিশরাজের জাঁক-জমক এবং প্রতাপ দেখিয়ে তাদের অভিভূত করে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। ইংরেজদের রাস্তা নির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া যে কত বড় মূঢ়তা হয়েছে তা বুঝতে পেরে তাদের দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। নিজের হাতেই

যে তারা নিজেদের বন্ধন-শৃঙ্খল তৈরির ব্যবস্থা করে দিয়েছে!

আত্মগ্লানিতে ভরে উঠে তীরত সিং-এর মন। আসলে তিনিই যে এর জন্যে দায়ী, তিনিই তো নিজের বুদ্ধির দোষে ইংরেজের ফাঁদে পা দিয়ে এই বিভ্রাটের সৃষ্টি করেছেন—খাল কেটে এনেছেন কুমীর।

যে ভুল তিনি করেছেন তার প্রতিকারের জন্যে তীরত সিং হয়ে উঠলেন বদ্ধপরিকর। এই সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলের খাসিয়াদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল। আসন্ন বিদ্রোহের আভাস পেয়ে তীরত সিং স্থির করলেন, খাসিয়া পাহাড় থেকে ইংরেজ-বিতাড়নের কোন-পরিকল্পনাই হোক্ না কেন, তাতে তিনি সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করবেন। ইতিমধ্যে মল্লিমের সামন্ত রাজা বরমাণিকের নেতৃত্বাধীনে সমস্ত পাহাড়িয়া সামন্ত রাজা এবং সর্দ্দাররা একযোগে নিজ নিজ অঞ্চল থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করবার তোড়জোড় সুরু করে দিয়েছেন।

প্রত্যাসন্ন বিপদের পূর্ব্বাভাস পেয়ে ১৮২৯-এর মার্চ্চ মাসের শেষের দিকে মিঃ স্কট একদল সৈন্য সহ ঝটিতি চেরাপুঞ্জীর দিকে অগ্রসর হলেন—তাঁর মতলব ছিল অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করে বরমাণিককে দমন করা। কিন্তু তিনি যা ভেবেছিলেন হল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। খাসিয়ারা আগে থেকেই তৈরি ছিল। খাসিয়া-সর্দ্দারদের বীরত্ব এবং বুদ্ধি-কৌশলে মিঃ স্কট রীতিমত জব্দ হলেন।

এই জয়লাভে উৎসাহিত হয়ে খাসিয়ারা ইংরেজদের পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের শোধ তুলবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। ফলে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে অনুষ্ঠিত হল সেই শোচনীয় ব্যাপার ইতিহাসে যা কুখ্যাত হয়ে আছে 'নংক্লৌ হত্যাকাণ্ড' নামে। এই দুর্ঘটনায় একজন অকর্ম্মণ্য য়ুরোপীয় এবং কয়েকজন বাঙালী প্রাণ হারাল।

নংক্লৌ হত্যাকাণ্ডের পর খাসিয়ারা মেতে উঠল ধ্বংসলীলায়, তারা জ্বালিয়ে দিলে নংক্লৌয়ের ডাক বাংলো, মুক্তি দিলে সেই সব খাসিয়াদের, ইংরেজরা যাদের বন্দী করে পথনির্ম্মাণে নিযুক্ত করেছিল। তার পর তারা মিঃ স্কটের সন্ধানে এগিয়ে চলল চেরাপুঞ্জীর অভিমুখে। এদিকে বিদ্রোহের আগুন তখন দেখতে দেখতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজদের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় খাসিদের প্রথম সাফল্যের কথা তড়িৎগতিতে খাসিয়া এবং গারোপাহাড়ের সর্ব্বত্র প্রচারিত হয়ে গেছে। অরণ্যে-পর্ব্বতে, খাসিয়া এবং গারোদের কুটিরে সর্ব্বত্র চলছে এই চমকপ্রদ ব্যাপার নিয়ে কানাকানি আর সলাপরামর্শ। পাহাড়ীরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে নব-প্রেরণায়, হাজারে হাজারে তারা বিদ্রোহের নায়কদের পতাকাতলে এসে সমবেত হতে লাগল।

বিদেশী ঐতিহাসিকেরা এই বিদ্রোহকে "নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড", "বন্য জাতির বর্ব্বরতার প্রকাশ" ইত্যাদি বলে বর্ণনা করে একে খেলো করবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এতো হল আসল ব্যাপারের বিকৃত ব্যাখ্যা, এর মূল ছিল গভীরে—ইংরেজের

অধীনতাপাশ থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই খাসিয়াজাতি সেদিন সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল।

তীরত সিং, বরমাণিক আর মসিং-এর মুকুন্দ সিং এই তিনজন ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক। এঁরা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে, আঁটঘাট বেঁধে কার্য্যে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আসামের দিককার গিরিপথসমূহ রক্ষার ভার পড়ল বরমাণিকের উপর। মিঃ স্কটের সাহায্যার্থে বাংলার সমতল অঞ্চল থেকে যাতে রসদ ও সৈন্যবাহিনী না আসতে পারে সেজন্যে তীরত সিং রক্ষী সৈন্যদল নিয়ে সিলেটের দিক আগলাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। পূর্ণবয়স্ক প্রায় সমুদয় পাহাড়ী—সংখ্যা তাদের দশ হাজারেরও অধিক হবে—তীর, ধনু, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি সহ তাদের মাতৃভূমি থেকে ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে নেতাদের চার পাশে এসে জড়ো হল। শুধু তাই নয়—তাদের এ দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে হাতিয়ার হাতে এল তাদের আত্মীয় গারোরা—তাদেরও একই উদ্দেশ্য, ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভ। নেতাদের নির্দ্দেশে প্রথমেই তারা স্থির করলে যে, মিঃ স্কট কর্ত্তৃক নির্ম্মিত রাজপথকে বিধ্বস্ত করে যান-বাহন ও লোকচলাচলের অনুপযোগী করে ফেলবে। তাদের এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হতে বিলম্ব হল না। সাত তাড়াতাড়ি রাস্তাটিকে ভেঙে চুরে বড় বড় গোটা গাছ এবং বৃক্ষের কাণ্ড ফেলে তারা এর উপর দিয়ে যানবাহনাদি চলাচল অসম্ভব করে তুলল, জায়গায়

জায়গায় তৈরি করলে চোখা আগাওয়ালা দণ্ডের কাঠরা আর রাস্তার উপরকার সেতুগুলিকে ভেঙে দিলে।

ইংরেজ-বিতাড়নের জন্যে তীরত সিং যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা যেমন ব্যাপক তেমনি বিরাট। নিজের অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে তিনি দূত পাঠালেন আহোম-রাজা চন্দ্রকান্তের নিকট। ভুটিয়া এবং সিংফোদের নিকটেও যথাসময়ে বার্তা প্রেরিত হল। আসামে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর বলাবল কিরূপ তা অবগত হবার জন্যে তীরৎ সিং গৌহাটি এবং অন্যান্য স্থানে চতুর গুপ্তচরদের প্রেরণ করলেন।

এই বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়লেন। বহু স্থানে রাজস্ব আদায় বন্ধ হয়ে গেল। এদিকে বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র আসাম প্রদেশ জুড়ে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হওয়াতে সরকারকে অত্যন্ত সাবধনতার সহিত, বিবেচনাপূর্ব্বক বিদ্রোহ-দমনের চেষ্টায় ব্রতী হতে হল; কেননা চালে সামান্য ভূল হলে সমগ্র আসাম জুড়েই প্রচণ্ড বিদ্রোহবহ্নি পূর্ণতেজে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল ষোল আনা। এদিকে আর এক মুশ্‌কিল, আসামের উপত্যকা-ভূমিতে যাতায়াতের দিকটা খাসিয়ারা এমনভাবে আগলে রেখেছে যে, সেদিক থেকে কোনো রকম সাহায্যে আসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিঃ স্কট পড়লেন মহা ফাঁপরে—এ অবস্থায় কি করা যায়! রসদের অভাবে যে সসৈন্যে শুকিয়ে মরতে হবে!

সৌভাগ্যক্রমে মিঃ স্কটের মুশ্‌কিল আসানের উপায় হল। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহায্য এল সিলেটের দিক থেকে। ক্যাপ্টেন

লিষ্টার একদল সৈন্যসহ বিদ্যুৎগতিতে চেরাপুঞ্জীতে গিয়ে পৌঁছলেন এবং মিঃ স্কট ও তাঁর সৈন্যবাহিনীকে সেই সঙ্কট-জনক অবস্থা থেকে উদ্ধার করলেন।

নংক্লৌ হত্যাকাণ্ডের খবর কলিকাতাস্থ সরকারী-মহলে গিয়ে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়। "অসভ্য" পাহাড়ীদের এই আচরণে কর্ত্তৃপক্ষের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছিল। তাঁরা আসামস্থ ব্রিটিশ এজেন্টকে এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করবার নির্দ্দেশ দিলেন যাতে এই সকল নগণ্য সর্দ্দারদের মনে নিদারুণ ত্রাসের সঞ্চার হয়। তীরত সিং সম্বন্ধে তাঁরা এই ফতোয়া জারী করলেন যেন তাঁকে এমন একজন "রক্ত-পিপাসু বুনো খুনী" রূপে গণ্য করা হয়, প্রাণদণ্ডই যার উপযুক্ত শাস্তি।

বাংলা সরকার তো আদেশ জারী করে নিশ্চিন্ত হলেন, কিন্তু তখন কি তাঁরা ভাবতে পেরেছিলেন যে, কিছুকাল পরেই একদিন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জনৈক প্রতিনিধিকে এক গিরিগুহার সোপানাবলী অতিক্রম করে, নিভৃততম স্থানে গিয়ে এই "অর্দ্ধনগ্ন, বন্য, রক্তপিপাসু, নরহন্তা" বিদ্রোহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। তদানীন্তন বাংলা সরকার খাসিয়া-বিদ্রোহের এই নায়কের সম্বন্ধে যতই অবজ্ঞাপূর্ণ উক্তি করে থাকুন না কেন, আসামের সমসাময়িক অনেক ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারীর নিকট কিন্তু তিনি এক জন উঁচুদরের দেশপ্রেমিক-রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন। যাই হোক্, এদিকে তীরত সিং এবং অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের শায়েস্তা করবার জন্যে

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁদের রাজ্যের বহু অঞ্চল দখল এবং ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। কিন্তু এতেও সুসভ্য ইংরেজ-জাতির প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ না হওয়ায় অনেকগুলি খাসিয়া-গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এত সব অত্যাচার উৎপীড়ন সত্ত্বেও কিন্তু বিদ্রোহের নায়কেরা বশ্যতা স্বীকার করলেন না, ফলে যুদ্ধবিরতির আশা সুদূরপরাহত বলে মনে হল—উভয় পক্ষই লড়তে লাগল একেবারে মরিয়া হয়ে।

এই যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) মিঃ স্কট অকস্মাৎ মারা গেলেন। তাঁর পরবর্ত্তী সৈন্যাধ্যক্ষ মিঃ রবার্টসন সংগ্রামের পথে না গিয়ে, কূটনীতির অনুসরণ দ্বারা খাসিয়া-বিদ্রোহের অবসান ঘটানো যায় কিনা সে-বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠলেন। খাসিয়া সর্দ্দার সিং মাণিকের সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা, তীরত সিং-এর সঙ্গে সন্ধির কথাবার্ত্তা চালানোর ভার তিনি সিং মাণিকের উপরেই অর্পণ করলেন। এতদুপলক্ষে সিং মাণিক বারকতক বিদ্রোহী খাসিয়া-সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা করেন। অবশেষে স্থিরীকৃত হল যে, সন্ধির কথাবার্ত্তা চালানোর ভারপ্রাপ্ত, ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধিস্থানীয় কোনো রাজ-কর্ম্মচারী একটি নির্দ্ধারিত দিবসে তীরত সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এতদনুসারে ১৮৩২ সনের ২৩এ আগষ্ট যুদ্ধ-বিরতির কথা ঘোষিত হল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্যাপ্টেন লিষ্টারের উপর তীরত সিং-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাবার ভার অর্পণ করলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে এই দুই কূটনীতিজ্ঞের মোলাকাৎ হল—দু'জনেই সমান চতুর ও কৌশলী—শিবাজী আর আফজল খাঁর সাক্ষাতের মত এও হচ্ছে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি।

খাসিয়া পাহাড়ের ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন এক নিভৃত গিরি-গুহায় সামন্ত রাজা তীরত সিং অমাত্যবর্গ-পরিবেষ্টিত হয়ে উপবিষ্ট, ক্যাপ্টেন লিষ্টারের আগমনের পর যথাযোগ্যভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হল। আসন গ্রহণ করে ক্যাপ্টেন লিষ্টার সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। নানা লোভনীয় প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি নিজের মতলব হাসিল করবার চেষ্টা করলেন। ওদিকে কূটবুদ্ধিতে তীরত সিংও কম যান না। ফাঁকা কথায় ভুলবার লোক তিনি নন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে খোলাখুলিভাবে স্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, সন্ধি হতে পারে কেবলমাত্র দুটি সর্ত্তে—(১) তাঁর রাজ্যের ভেতরকার নবনির্ম্মিত রাস্তাটির উপর দখল ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হবে, আর (২) তাঁর হৃত রাজ্য তাঁকে প্রত্যর্পণ করতে হবে।"

এই ধরণের প্রস্তাবের জন্যে ক্যাপ্টেন লিষ্টার প্রস্তুত ছিলেন না, খাসিয়া সর্দ্দার যে এতটা দৃঢ়তাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করবেন ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ তা আশা করতেও পারেন নি। তিনি এসেছিলেন ছেঁদো কথায় ভুলিয়ে-ভালিয়ে মতলব হাঁসিল করবার জন্যে। কিন্তু তীরত সিং-এর কথায় তিনি নিরাশ হলেন, কেননা তীরত সিং যে সকল দাবী উত্থাপন করলেন সেগুলি সম্বন্ধে কোনো মতামত ব্যক্ত করবার নির্দ্দেশ সরকার তাঁকে দেন নি। কাজেই আপোষ-আলোচনা

ব্যর্থ হয়ে গেল, নিরাশ হয়ে ক্যাপ্টেন লিষ্টার ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় নিয়ে চলে এলেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যখন দেখলেন যে, লিষ্টারের সন্ধি-প্রস্তাবে কোনো ফল হল না, তখন তারা তীরত সিংকে জব্দ করবার জন্যে আর একটা নূতন ফন্দী আঁটলেন। তীরত সিং-এর অনুচরদের নিকট গোপনে তাঁরা একটি আলাদা সন্ধির-প্রস্তাব পাঠালেন। সেটির সর্ত্ত হচ্ছে এই যে, তীরত সিংকে যদি তারা সরকারের হাতে সঁপে দিতে রাজী হয় তা হলে তাদের সকল দাবী মেটানো হবে।

কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এক্ষেত্রেও চালে ভুল করলেন, কেননা, একথা তাঁদের জানা ছিল না যে, তীরত সিং-এর অনুচরেরা সকলেই ছিল তাঁর এমন অনুরক্ত যে, তাঁর আদেশে হাসিমুখে জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে তাদের দ্বিধা ছিল না। কাজেই যে টোপ সরকার ফেললেন তা তারা গিলল না। তখন মিঃ রবার্টসন চিন্তা করে দেখলেন যে, এ ধরণের আপোষ-আলোচনার চেষ্টা করে কোনো লাভ হবে না—পুরোপুরি অর্থনৈতিক অবরোধই হচ্ছে উদ্দেশ্যসিদ্ধির একমাত্র পন্থা। তখন খাসিয়া পাহাড়ের চারিদিকে অর্থনৈতিক অবরোধ-প্রাচীর রচনা করে তিনি বিদ্রোহীদের বাগ-মানাবার আয়োজন করলেন। এদিকে রাজা সিং মাণিক তীরত সিংকে বার বার ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণের কথা বলেও রাজী করাতে পারেন নি ; তিনি দেখলেন এবার উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত। তীরত সিং-এর কাছে গিয়ে তিনি আর ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রামে

শক্তিক্ষয় করা যে বৃথা সেকথা ভালো করে বুঝিয়ে বললেন। এদিকে তীরত সিং-এর লোকবলও ক্রমে ক্রমে নিঃশেষিত হয়ে আসছে, বহু সৈন্যের মৃত্যু হয়েছে, অনেকে পালিয়ে যাচ্ছে তাঁর দল ছেড়ে—এমতাবস্থায় রাজা সিং মাণিক সময় বুঝে যে ঔষধ প্রয়োগ করলেন তার প্রতিক্রিয়া ঠিকমতই হল। সিং মাণিকের প্রচুর উপদেশবর্ষণের ফলে ইংরেজ-রাজশক্তিকে প্রতিরোধ করবার যাবতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হওয়ায় অবশেষে ১৮৩৩-এর ১৩ই জানুরারি আজন্ম স্বাধীনতাপ্রিয় তীরত সিং ব্রিটিশ সরকারের নিকট আত্ম-সমর্পণ করলেন। সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তাঁকে প্রাণে বধ করা হবে না। দেশই ছিল তীরত সিং-এর ধ্যান-জ্ঞান—দেশের কল্যাণই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। আত্মসমর্পণকালেও তিনি তাঁর প্রিয় মাতৃভূমিকে বিস্মৃত হন নি এবং ভারপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারীকে সনির্ব্বন্ধভাবে এই অনুরোধ জানান যেন তাঁরা তাঁর হস্তচ্যুত রাজ্যে সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন।

এবার সুরু হল তীরত সিং-এর জীবনের বিষাদমাখা শেষ অধ্যায়। প্রথমে তাঁকে পাঠানো হল গৌহাটিতে। পলিটিক্যাল এজেন্ট আদেশ দিলেন, তাঁকে ভারতের বাইরে টেনাসেরিম প্রদেশে অন্তরায়িত করা হবে। কিন্তু বাংলা সরকার এই আদেশ রদ করে তাঁকে ঢাকায় পাঠিয়ে সেখানে আটক রাখা সাব্যস্ত করলেন। তখন এই দেশপ্রেমিক পার্ব্বত্য নৃপতির গৌরবের দিনের অবসান হয়েছে, এবার তিনি সর্ব্বহারা, রিক্ত,

কপর্দ্দকহীন। এই রাজভিখারী যেদিন ঢাকা গিয়ে পৌঁছলেন সেদিন একটিমাত্র মোটা কম্বল ছাড়া তাঁর আর কোনো গাত্রাবরণ ছিল না। প্রথমে জেলে তাঁকে সাধারণ কয়েদীরূপে রাখা হয়, শেষে আলাদা একটি বাড়ীতে স্থানান্তরিত করে তাঁর জন্যে মাসিক ৬৩৲ টাকা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়, এবং সরকার দয়া করে তাঁর জন্যে দু'টি চাকরও রেখে দেন। এমনিভাবে অদৃষ্টচক্রে শেষ স্বাধীন খাসিয়া নৃপতি তাঁর চিরপ্রিয় মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে নিভৃত বন্দীনিবাসে নিঃসঙ্গ অবস্থায় তিল তিল করে মরণের পথে এগুতে থাকেন। অবশেষে ১৮৪১ সনে মৃত্যু তাঁকে সকল দুঃখ-দুর্গতি, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা আর অপমানের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিলে।

রাণী গাইডিলউ * এবং নাগাদের মুক্তি-সংগ্রাম

মণিপুর-উপত্যকার চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড়শ্রেণীতে টাংখুল কাবুই, মারিং প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাগাদের বাস। এরা পাহাড় থেকে নেমে মণিপুরের রাজধানী ইম্‌ফলের হাটে সওদা করতে আসে। এই নাগা-সম্প্রদায়ের মধ্যে কাবুইদের লজ্জা সরমের বালাই কম। কাবুই পুরুষদের পরণে এক-একটি ঝোলা নেংটি ঘুনসিতে আটকানো।

* ইনি গুইদালো নামে আমাদের নিকট পরিচিত। এটা কিন্তু এঁর নামের ভুল উচ্চারণ।

এই কাবুই নাগাবংশের কন্যা গাইডিলিউ। কাবুইদের দেশে আধুনিক সভ্যতার রশ্মিচ্ছটা এখনো একপ্রকার পৌঁছে নি বললেই চলে। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির আলোক থেকে এরা বঞ্চিত।

কিন্তু গাইডিলিউ এদের সমাজে ব্যতিক্রম। ছোটবেলা থেকেই খ্রীষ্টান মিশনারীদের পরিচালিত একটি স্কুলে তাঁর শিক্ষালাভের সুযোগ হয়। সেখানে নবম দশম মান পর্য্যন্ত তিনি অধ্যয়ন করেন। শিক্ষার দৌলতে মহাত্মা গান্ধীর নামের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন এবং তৎপ্রবর্ত্তিত রাজনৈতিক আন্দোলনেরও ভাসাভাসা পরিচয়লাভ করেন।

এই পাহাড়ী মেয়েটির দাপটে একদা আসামে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেকে বিব্রত হতে হয়েছিল। তদানীন্তন সরকার গাইডিলিউর নেতৃত্বে নাগাপাহাড়ে পরিচালিত নাগাদের মুক্তিসংগ্রামের বিকৃত ব্যাখা করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করেছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহ্‌রু যখন আসাম ভ্রমণে যান তখন গাইডিলিউর দেশপ্রেম আর দেশের জন্যে তাঁর অপরিসীম দুঃখ বরণের কথা শুনে অভিভুত হন এবং একটি প্রবন্ধ লিখে মুক্তিসংগ্রামের এক বিস্মৃত অধ্যায়কে লোকলোচনের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করেন।

আসামের নাগা পাহাড়েই প্রধানতঃ নাগাদের বাস—এরা আঙ্গামী, আও, লোটা, সেমা, রেঙ্গমা ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। মণিপুর-উপত্যকার চতুষ্পার্শ্বস্থ পাহাড়শ্রেণীও কাবুই কাচা, চিরু, মারিং প্রভৃতি বহু শ্রেণীর নাগাদের দ্বারা অধ্যুষিত।

নাগারা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় জাত, এদের তাঁবে আনতে ইংরেজদের অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নাগাদের বিরুদ্ধে বারংবার অভিযান প্রেরণ করেও সাফল্যলাভ করতে পারেন নি, অবশেষে নানা প্রকার কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাঁরা নাগাদের বশীভূত করেন বটে, কিন্তু তাদের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে দমাতে সক্ষম হন নি। স্বাধীনতালোপের পর প্রায়ই বিদ্রোহ করে তারা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বিব্রত করে তুলত।

কালক্রমে অধিকাংশ নাগা ব্রিটিশের প্রভুত্ব মেনে নিলেও নাগাপাহাড়ের পূর্ব্বাঞ্চলের প্রান্তসীমাবাসী কোনো কোনো সম্প্রদায়ের নাগাদের বাগ মানানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এরা আজও সম্পূর্ণ স্বাধীন—এদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে নরমুণ্ড শিকারের প্রথা এখনো প্রচলিত।

ব্রিটিশ আমলে নাগাপাহাড় প্রভৃতি আসামের কতকগুলি জেলা ছিল সম্পূর্ণরূপে শাসন-সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চল (excluded area)। নাগাপাহাড়ের শাসন-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে গবর্ণমেণ্ট নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলে একটা কাল্পনিক সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন। ঐ সীমারেখার বাইরে তাঁরা শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন না। এই আভ্যন্তরীণ সীমারেখার (inner line) ভেতরে যে সকল নাগা ব্রিটিশের শাসন ও রক্ষণাধীনে বাস করত তাদের পরিবারপিছু সরকারকে তিন টাকা করে গৃহ-কর দিতে হ'ত। কিন্তু ঐ সীমারেখার ওপারের বাসিন্দা নাগাদের উক্ত কর দেওয়ার কোনোরকম

বাধ্যবাধকতা ছিল না। ব্রিটিশশাসিত অঞ্চলের নাগাদের বিনা মজুরিতে স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের নানা কাজ করে দিতে হ'ত, কিন্তু উক্ত সীমারেখার বাইরের নাগাদের এরূপ কোনো নিয়ম ছিল না।

স্বাধীন নাগাদের সঙ্গে নিজেদের অবস্থার কথা তুলনা করে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলের নাগাদের মনঃকষ্টের পরিসীমা ছিল না। আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের নাগাপাহাড়শ্রেণীর পানে তাকিয়ে তারা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত, আর কিভাবে ইংরেজের সকল রকম জুলুমজবরদস্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সেকথা ভাবত। কিন্তু শুধু ভাবনাই সার, কাজে কিছু করবার সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত।

এমনিভাবে কাটছিল বছরের পর বছর। হঠাৎ ১৯৩০ সালে সমগ্র ভারত যখন মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের বন্যায় ভেসে গেল তখন সেই আন্দোলনের স্রোত আসামের সমতল অঞ্চল প্লাবিত করে নাগা পাহাড়েও গিয়ে প্রবেশ করল। এইবার অন্ধকারের মধ্যে আশার আলো দেখতে পেলেন নাগানেতা যাদুনাঙ্ আর তাঁর সম্পর্কিতা বোন উনিশ বছরের নাগাতরুণী গাইডিলিউ। জাতির স্বাধীনতার স্বপ্নকে সফল করতে হলে কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে, আইন-অমান্য আন্দোলন থেকে তাঁরা পেলেন তারই হদিস।

যাদুনাঙ্ আর গাইডিলিউ উভয়েরই আদিম রক্তে হিংসার বীজ, সংগ্রামে শত্রুক্ষয়ের উদগ্র উন্মাদনা। তাই মহাত্মাজীর অহিংসার আদর্শ হয়তো তাঁরা বোঝেন নি, তবে এটা তাঁরা

মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, শাসক ইংরেজেরা তাঁদের মাতৃভূমির শত্রু, তাদের অধীনতাপাশ ছিন্ন করবার জন্যে হানতে হবে চরম আঘাত। তাঁরা নাগা পাহাড়ে করবন্ধ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করলেন—ব্রিটিশ শাসনের কবলমুক্ত হয়ে 'নাগারাজ' প্রতিষ্ঠা হল তাঁদের উদ্দেশ্য।

যাডুনাঙ্ এবং গাইডিলিউর আহ্বানে নাগারা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। তারা গৃহকর দেওয়া বন্ধ করলে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হুকুমে মজুরের কাজ করতেও অসম্মতি জানালে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের আয়োজনে মেতে উঠল। দেখতে দেখতে উত্তর পশ্চিম মণিপুরের কাবুই এবং কাচা নাগাদের মধ্যে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট অঙ্কুরেই এ বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন, কিন্তু ব্যাপারটা তাঁদের নিকট খুব সহজসাধ্য বলে মনে হল না। অবশেষে অনেক তোড়জোড়ের ফলে সরকারী কর্ম্মচারীরা যাডুনাঙ্‌কে বন্দী করতে সক্ষম হলেন (১৯৩০ খ্রীঃ)। তাঁকে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল। আন্দোলনের গতি কিন্তু এতে ব্যাহত হল না। এবার মুক্তি-সংগ্রামে জাতিকে পরিচালিত করবার ভার গ্রহণ করলেন গাইডিলিউ স্বয়ং—নাগারা তাঁকে রাণী আখ্যায় ভূষিত করলে। নাগাদের উপর রাণী গাইডিলিউ এমন প্রভাব বিস্তার করলেন যে, তাঁর আদেশে তারা হাসিমুখে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করবার জন্যে প্রস্তুত হল। দেখতে দেখতে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল—মণিপুর, উত্তরকাছাড়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ এবং নাগা

পাহাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ব্যাপকভাবে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করল। গাইডিলিউর নেতৃত্বের ক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্বের প্রভাব দেখে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। এই সমস্ত পার্ব্বত্য অঞ্চল ছিল মণিপুর দরবারের ব্রিটিশ প্রেসিডেণ্ট মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের শাসনাধীনে। তিনি গাইডিলিউকে বন্দিনী করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু গিরিকন্দরের কোন্ নিভৃত স্থানে থেকে যে গাইডিলিউ বিদ্রোহী নাগাদের পরিচালিত করতেন তার কোনো হদিস পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠল না। অবশেষে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে মণিপুর দরবার থেকে ঘোষিত হ'ল গাইডলিউর গতিবিধি এবং তাঁর আবাস-স্থল সম্বন্ধে যে-ব্যক্তি খবর দিতে পারবে তাকে দু'শ টাকা অথবা বন্দুক পুরস্কার দেওয়া হবে।

কিন্তু এতেও কোনো ফল হল না। ১৯৩২ সালের প্রথম ভাগ শেষ হলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করলেন, যে-কেউ গাইডিলিউ সম্বন্ধে সঠিক খবর দিতে পারবে তাকে ৫০ ৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে; তাঁরা এ কথাও প্রচার করলেন—যে-গ্রাম গাইডিলিউকে বন্দিনী করায় সহায়তা করবে সেই গ্রামের লোকেদের দশ বৎসরের গৃহ-কর পুরোপুরি মকুব করা হবে। ১৯৩২ সালের গোড়ার দিক থেকেই গাইডিলিউকে ধরবার জন্যে গবর্ণমেণ্ট চারদিকে বাগুরাজাল বিস্তার করেছিলন, কিন্তু ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে গাইডিলিউ এমন কৌশলে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন যে, তাঁকে ধরতে গিয়ে সরকার হিমসিম খেয়ে গেলেন।

এই সব উপায় যখন ব্যর্থ হল, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তখন বিদ্রোহ দমনের জন্যে বর্ব্বরোচিত নীতি অবলম্বন করলেন। উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে যে সকল সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হতে লাগল তারা নাগা গ্রামগুলিতে হানা দিয়ে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার. উৎপীড়নের চূড়ান্ত করলে। বপুঙ্গুয়েমি নামে গোটা একটা গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গে নাগা পাহাড়ের হেনিমা এবং উত্তরকাছাড়ের হাংগ্রাম নামক দুইটি ফাঁড়িতে দু'টি সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হল। মার্চ্চ মাসে নাগারা প্রচণ্ড বিক্রমে শেষোক্ত ফাঁড়িটির উপর চড়াও করলে, কিন্তু তাদের আক্রমণ প্রতিহত হল। সেপ্টেম্বর মাসে ক্যাপ্টেন লাউজলির অধিনায়কত্বে আর একটি সৈন্যবাহিনী হেনিমাতে এসে আড্ডা গাড়ল।

অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খবর পৌঁছল যে, নাগা-বিদ্রোহের অধিনায়িকা গাইডিলিউ খনোমা গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন এক স্থানে অজ্ঞাতবাসে আছেন। তাঁকে বন্দী করবার জন্য অবিলম্বে দুটি সৈন্যবাহিনী একদা রাত্রির অন্ধকারে দুরূহ দুর্গম পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করে খনোমা গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। দিনকতক পরে একদিন সদ্যনিদ্রোত্থিত গ্রামবাসীরা বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে দেখলে, অভিযাত্রী ইংরেজ সৈন্যদল তাদের জন্মপল্লী ঘেরাও করে ফেলেছে—নাগারা তৈরি হবার অবসরটুকুও পেলে না। গ্রাম দখল করে ইংরেজরা গাইডিলিউ এবং তাঁর অনুচরদের খুঁজে বের করলে। ১৯৩২ সালের ১৭ই অক্টোবর নাগারাণী গাইডিলিউ শত্রুহস্তে বন্দিনী

হওয়ার পর নাগা-বিদ্রোহ প্রশমিত হল। মণিপুরের পলিটিক্যাল এজেন্ট গাইডিলিউকে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন—তখন তাঁর বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। কারাগারের নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে এই বিদ্রোহিণী নাগা-তরুণীর দিন কাটতে লাগল।

মণিপুর দরবারের প্রেসিডেন্ট রাণী গাইডিলিউকে যাদুকরী বলে প্রচার করে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। রাণী গাইডিলিউ যাদুকরীই বটে, কিন্তু সে প্রচলিত অর্থে নয়। তাঁর যাদুমন্ত্রে আকৃষ্ট হয়ে নাগারা একদিন মুক্তির নেশায় পাগল হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট প্রাণপণ চেষ্টা করেও সত্যকে চাপা দিয়ে রাখতে পারেন নি। নরহন্ত্রী রূপে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল বটে, কিন্তু ১৯৩২-৩৩ সনের আসাম পুলিশ এডমিনিষ্ট্রেশন রিপোর্টে দেখি, গাইড়িলিউকে "নাগা বিদ্রোহের অধিনায়িকা" বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু গাইডিলিউ সম্বন্ধে বলেছিলেন—"She dreamed of freedom for her people and raised her banner of independence and called her people to rally round it" অর্থাৎ—"তিনি স্ব-জাতির স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং স্বাধীনতার পতাকা উর্দ্ধে উত্তোলিত করে সবাইকে তার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হবার জন্যে অহ্বান করেছিলেন।"

দীর্ঘকাল নির্জ্জন কারাবাসের পর কয়েক বৎসর হল গাইডিলিউ মুক্তিলাভ করেছেন। গিরিকান্তারে মুক্ত বন্য

হরিণীর মত ছুটাছুটি করে কেটেছিল যে পাহাড়ী মেয়ের শৈশব আর কৈশোর, যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি তার অপচিত হল লোকচক্ষুর অগোচরে, কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে অবর্ণনীয় দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করে। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে নাগা-রাণী গাইডিলিউর অতুলনীয় দেশপ্রেম ও বীরত্ব-কাহিনী অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হো, মালপাহাড়িয়া ও সাঁওতাল বিদ্রোহ

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হো, মালপাহাড়িয়া, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীদের অভ্যুত্থান হয়। ইংরেজেরা যখন এই সমস্ত আদিবাসীদের জাতীয় স্বার্থে ঘা দিলে, তাদের শোষণ করবার মতলবে সুরু করে দিলে নানারকম জোর-জবরদস্তি তখন তাদের মন বিরূপ হয়ে উঠল এবং তারা এই অন্যায় আচরণের প্রতিবিধানকল্পে বিদ্রোহের আয়োজনে মেতে উঠল।

ব্রিটিশ আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোল, ভীল সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসীরা নিজেদের রীতিনীতি ইত্যাদি নিয়ে পাহাড়-জঙ্গলে নিশ্চিন্তভাবে বাস করছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন এদেশের মালিক হয়ে বসল তখন তাদের নজর পড়ল এই সকল আদিবাসীদের দিকে এবং কি ভাবে তাদের শোষণ করা যায় তারা সেই ফন্দী আঁটতে লাগল। তারা ভেবে দেখলে যে, হিন্দুদের সহায়তা ছাড়া তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সেইজন্যে

এই কাজে হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের লাগাবার জন্যে তারা কৌশলজাল বিস্তার করলে। আদিবাসীদের স্বার্থ আর হিন্দুর স্বার্থ যে এক সেকথা ভুলে গিয়ে কোনো কোনো শ্রেণীর হিন্দুরা ইংরেজের ফাঁদে পা দিলে।

ইংরেজেরা এই সকল আদিবাসীদের অধ্যুষিত অঞ্চলে নিজেদের আইন-কানুন, জারী করলে, জমির খাজানা আদায় ও রাজস্ব-প্রথার প্রবর্ত্তন করলে—এতে আদিবাসীদের সনাতন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে একটা মস্ত বড় ওলট-পালট হয়ে গেল। এদিকে ইংরেজেরা হিন্দু সরকারী কর্ম্মচারীদের আদিবাসীদের এলাকাগুলিতে নিয়ে যেতে লাগল। হিন্দু জমিদার এবং মহাজন শ্রেণীর প্রবেশের পথও সেখানে সুগম হল—এরা হল আদিবাসীদের শোষণে ইংরেজের সবচেয়ে বড় সহায়ক।

হো বিদ্রোহ—সিংভূমের কোলহান অঞ্চলে প্রধানতঃ হোদের বাস, এদের আর এক নাম লড়কা কোল অর্থাৎ লড়নেওয়ালা কোল। ইংরেজদের এই সমস্ত তোড়জোড় এবং হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের সঙ্গে তাদের যোগসাজশ দেখে হোরা সন্দিহান হয়ে উঠল এবং হিন্দুরা তাদের দেশের ভিতরকার যে-পথ দিয়ে পুরীতে তীর্থ করতে যেত সেটি বন্ধ করে দিলে।

হোদের শায়েস্তা করবার জন্যে ১৮১৯ সংলে ইংরেজেরা একদল সৈন্য প্রেরণ করলে, কিন্তু এত সহজে হোদের বাগ-মানানো সম্ভবপর হয়ে উঠল না, তাদের সমাজে ভেতরে ভেতরে

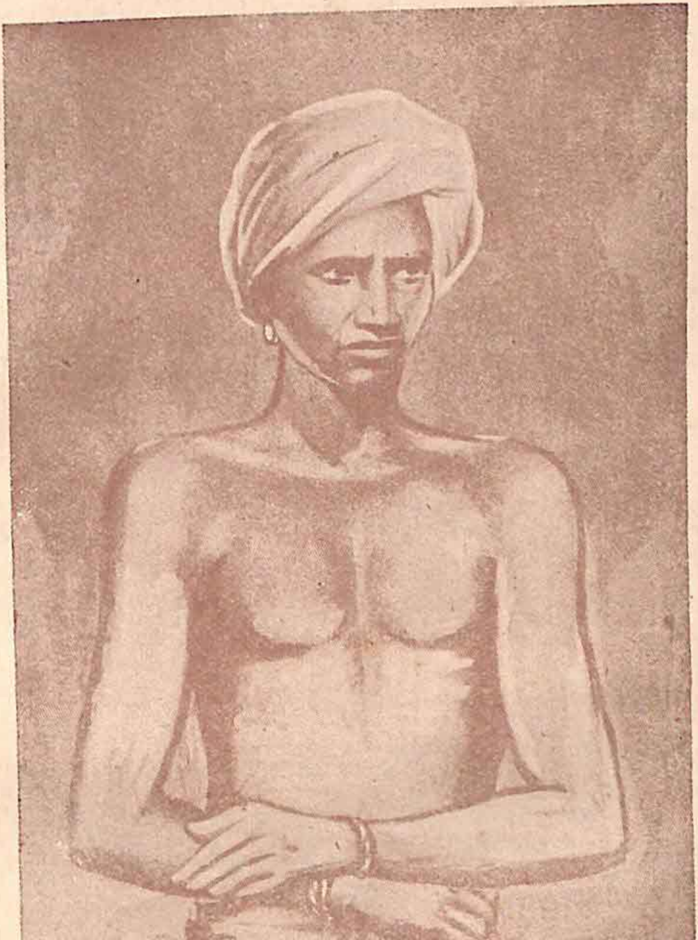
একটা তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হতে লাগল। অবশেষে ১৮৩১ সালে সেই উপচীয়মান অসন্তোষ প্রচণ্ড বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করল—ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের এ অভ্যুত্থান কোল বিদ্রোহ নামে সরকারী বিবরণী ইত্যাদিতে উল্লিখিত হয়েছে। কোলহানের হোরাও এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। এই সমস্ত আদিবাসীদের সম্বল ছিল শুধু তীর ধনু আর কুঠার। শেষ পর্য্যন্ত তারা ইংরেজের আগ্নেয়াস্ত্রের নিকট পরাস্ত হয়।

রাজমহলের মালপাহাড়িয়া বিদ্রোহ—তখন এদেশে সবে ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন হয়েছে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের কোনো কোনো শ্রেণীর আদিবাসীদের নিয়ে ইংরেজেরা বিব্রত হয়ে পড়েছে—মাঝে মাঝে তারা সমতলে হানা দিয়ে লুঠতরাজ ইত্যাদি করে বিভ্রাট বাধাতে সুরু করেছে।

রাজমহলের পাহাড়িয়ারা ছিল এমনি এক দুর্দ্দান্ত জাত। মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসে তারা হিন্দু জমিদারদের এলাকায় নানারকম অত্যাচার উপদ্রব করত। জমিদারেরা এদের মনে আতঙ্কসৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে একটা অত্যন্ত নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করেন। নিজেদের এলাকায় পাহাড়িয়াদের আমন্ত্রণ করে এনে তারা তাদের সবাইকে হত্যা করেন। (১৭৭২ সাল)। এই বিশ্বাসঘাতকতায় পাহাড়িয়ারা একেবারে ক্ষেপে উঠে জমিদারদের নাস্তানাবুদ করে তোলে। অবশেষে জমিদারদের সাহায্যার্থে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী এসে উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষে বাধে প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ। পাহাড়িয়ারা

ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিহত করে বেপরোয়া আক্রমণ ও লুঠতরাজ চালাতে থাকে ; শেষে কতকগুলি বিশেষ সর্ত্তে ইংরাজদের সঙ্গে তাদের আপোষরফা হয়।

সাঁওতাল বিদ্রোহ—১৮৩৬ সালে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সাঁওতালদের বসবাসের জন্যে যে অঞ্চলটি নির্দ্দিষ্ট করে দেন, সেটি তখন দামনি কো এই নামে পরিচিত ছিল। সাঁওতাল চাষীরা চাষবাস করে এখানে প্রচুর শস্য উৎপাদন করে। ক্রমে এই এলাকা একটি সমৃদ্ধ অঞ্চলে পরিণত হয়। তখন এর উপর হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের নজর পড়ে। এরা নানাপ্রকার কৌশলে সাঁওতাল চাষীদের জমি ও ফসল হস্তগত করতে থাকে। এমনিভাবে সাঁওতালরা যখন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যায় তখন তাদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। দেখতে দেখতে দিকে দিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে, নির্ব্বিচারে তারা হিন্দু এবং মহাজনে কুঠিয়াল ও প্ল্যান্টার ইংরেজদের হত্যা করতে থাকে। তখন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের টনক নড়ে উঠল, পঙ্গপালের মত ব্রিটিশ ফৌজ এসে দামিন কো অঞ্চল ছেয়ে ফেললে। সাঁওতালরা ব্রিটিশ আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হল। এই বিদ্রোহের আগুনে দশ হাজার সাঁওতাল আত্মাহুতি দেয়।



বীরসা ভগবান

মুণ্ডানেতা বীরসা ভগবান

ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের মূলে রয়েছে একটা সমগ্র জাতির সুদীর্ঘকালের সাধনা। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা নায়কত্ব করেছেন, জাতিকে যাঁরা নূতন পথের সন্ধান দিয়েছেন তাদের নিকট জাতি অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। মুণ্ডা-নেতা বীরসা ভগবান ভারতের এমনি একজন শ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধক। মহাত্মা গান্ধীর বহুপূর্ব্বে এই আদিবাসী নেতা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম অস্ত্ররূপে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রবর্ত্তন করেছিলেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলন এবং কংগ্রেস প্রবর্ত্তিতগণ সংগ্রমের বহু পূর্ব্বে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কত বীরসাপন্থী মুণ্ডা যুবক যে তিলে তিলে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে শুকিয়ে মরেছে, এমন কি হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পর্য্যন্ত দ্বিধা বোধ করে নি কে তার হিসাব রাখে?

এই বীরসা মুণ্ডাকে তাঁর স্বজাতিরা দেবতার আসনে বসিয়েছিল, তাঁদের নিকট আজও তিনি বীরসা ভগবান নামে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

১৮৭৪ সালে রাঁচির এক মুণ্ডা পরিবারে বীরসার জন্ম হয়। তখন মুণ্ডাদের মুলুকে খ্রীষ্টান মিশনারীরা কায়েমিভাবে বসে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার ও মুণ্ডাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করছেন।

বীরসা ছোটবেলায় রাঁচিতে মিশনারীদের এক স্কুলে ভর্ত্তি হয়ে লেখা-পড়া শেখেন, সামান্য ইংরেজীও তিনি শিখেছিলেন। জার্ম্মাণ মিশনারী কর্তৃক তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

কিন্তু স্কুলের বাঁধাধরা রুটিনের মধ্যে তাঁর মন আবদ্ধ থাকতে চাইল না, জাতির দুঃখদুর্গতি কিশোর বয়সেই তাঁর মনকে বেদনায় পরিপূর্ণ করে তুলল, ইংরেজের অধীনতা-পাশ কি করে ছিন্ন করা যায় তাই হল তাঁর একমাত্র ভাবনা।

শহরের জাঁকজমক আর প্রলোভন তাঁকে আটকে রাখতে পারল না। রাঁচি থেকে একদিন চলে গেলেন তিনি পাহাড়ের উপরকার তাঁর নিভৃত পল্লীকুটিরে। গ্রামবাসীদের ডেকে বললেন—"ভাই সব, তোমরা ওঠো জাগো, দেশের কাজে লেগে যাও। দেবতা স্বপ্নে আমায় প্রত্যাদেশ দিয়েছেন—মুণ্ডাদের এগিয়ে আসতে হবে দেশের সেবায়। তোমরা মদ খাওয়া ছাড়, উপবীত নাও, নিরামিষ আহার সুরু করো।"

মুণ্ডারা তাঁর কথায় এক নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে তাঁর ভাবধারা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, মুণ্ডাদের এলাকায় জাগল এক প্রবল আন্দোলনের সাড়া। এতে ইংরেজ সরকার রীতিমত ভড়কে গেলেন—বীরসার কি মতলব কে জানে! বীরসাপন্থীদের সঙ্কল্পকে দৃঢ়তর করে তুলল সরকারের দমননীতি। ক্রমে বীরসার নায়কত্বে এ আন্দোলন পুরোপুরি রাজনৈতিক আন্দোলনের আকার ধারণ করলে। বীরসা দেশবাসীকে ডেকে বললেন—"বন্ধ করো ইংরেজ সরকারকে খাজনা দেওয়া"। তাঁর নির্দ্দেশে মুণ্ডারা খাজনা দেওয়া থেকে বিরত হল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এইটেই সর্ব্বপ্রথম করবন্ধ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত।

বেগতিক দেখে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট এই আন্দোলন দমন করবার জন্যে পুলিশ-বাহিনী প্রেরণ করলেন, পুলিশের সঙ্গে বীরসাপন্থীদের বাধল প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষ। মুণ্ডারা ক্ষেপে গিয়ে থানা কাছারি আদালত ইত্যাদি পুড়িয়ে দিতে লাগল এবং রেলপথ ধ্বংস ও টেলিগ্রাফের তার কেটে যোগাযোগ-ব্যবস্থা বিছিন্ন করে দিলে। বীরসা-প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট মনে মনে প্রমাদ গণলেন। অবশেষে তাঁকে গ্রেফতার করে রাঁচি জেলে এনে বন্দী করে রাখা হল।

যেদিন বীরসা ভগবানকে কারারুদ্ধ করা হয় সেই রাত্রিতেই মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল, উঠল প্রচণ্ড ঝড়—এই জন-নায়কের লাঞ্ছনায় প্রকৃতি যেন ক্ষেপে উঠল। ঝড়ের ঝাপটায় ধ্বসে পড়ে গেল রাঁচি জেলের প্রাচীর। বীরসাকে তখন সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হল হাজারিবাগ জেলে। কিন্তু ইংরেজের সাধ্য কি এই মুক্তিপূজারীকে বন্দীশালায় আটকে রাখে! হাজারিবাগ জেলে ১৯০২ সালে বীরসার জীবনান্ত হল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মুণ্ডা ও সাঁওতাল

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে খণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে আদিবাসীদের যে সমস্ত অভ্যুত্থান হয়েছে তন্মধ্যে কতকগুলির কথা আমরা আগেকার অধ্যায়গুলিতে বর্ণনা করেছি। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, সারা ভারত জুড়ে যখন জাতীয় আন্দোলনের বান ডেকেছে আদিবাসীরা তখনো পিছিয়ে থাকে নি, দলে দলে তারা এসে

দেশের মুক্তিকল্পে স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। আমরা সকল ক্ষেত্রে তাদের তেমন ভাবে ডাক দিই নি, কিন্তু এ দেশের কল্যাণেই যে তাদের প্রকৃত কল্যাণ সে বোধ তাদের মনে পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত হয়েছিল বলেই তারা সেদিন হাসিমুখে সকল দুঃখ-কষ্ট, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন বরণ করে নিতে পেরেছিল।

১৯৩৯ সালে উড়িষ্যার গাঙ্গপুর রাজ্যে সুরু হল প্রবল প্রজা আন্দোলন। আদিবাসীরাও এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে খাজানা দেওয়া বন্ধ করলে। গাঙ্গপুরের রাণী সাহেবা খ্রীষ্টান মুণ্ডাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আন্দোলন বন্ধ করবার চেষ্টা করেন।

এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নির্ম্মল মুণ্ডা নামক জনৈক আদিবাসী। তাঁর নির্দ্দেশে মুণ্ডারা পুরোদমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। কিছুদিন পরেই নেতাদের ধরবার জন্যে দরবার কর্ত্তৃক প্রেরিত একদল সৈন্য দহিজিরা নামক একটি মুণ্ডাগ্রাম ঘেরাও করে। কয়েকজন নেতা ধরা পড়েন, কিন্তু নির্ম্মল মুণ্ডা রহস্যজনকভাবে অন্তর্ধান হন এবং পুলিশের সতর্ক-দৃষ্টি এড়িয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগঠন-কার্য্য চালাতে থাকেন। নির্ম্মল মুণ্ডার আশ্চর্য্য সংগঠন-শক্তির দরুন মুণ্ডারা এমনভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয় যে, কোনো সরকারী কর্ম্মচারী কিংবা পুলিশ গ্রামে এলেই দামামা বাজানো হ'ত আর সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামবাসীরা তীর ধনুক ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। একবার নির্ম্মল মুণ্ডা নিজে একটি টাঙ্গি নিয়ে একজন চৌকিদারকে তাড়া করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করবার সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল তখন দরবার ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট সৈন্যবাহিনী প্রেরণের জন্যে

অনুরোধ করেন, তদনুসারে জনৈক ব্রিটিশ সামরিক কর্ম্মচারীর অধীনে মুণ্ডাদের এলাকায় পঞ্চাশ জন সৈন্য পাঠানো হয়। সামরিক কর্ম্মচারীরা নির্ম্মল মুণ্ডাকে গ্রেফ্তার করবার উদ্দেশ্যে এই সৈন্যদল ও পুলিশবাহিনীসহ একটি গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন। এদের বাধা দেবার জন্যে এক জনতা লাঠি ও কুঠার ইত্যাদি সহ অগ্রসর হয়। পুলিশ বেমালুম গুলি চালাতে থাকে, ফলে অকুস্থলে ৩২ জন মুণ্ডা নিহত হয়। শেষে নির্ম্মল মুণ্ডাকে ঘর থেকে বের করে এনে গ্রেফ্তার করা হয়।

ভারতের দেশীয় রাজ্যের প্রজা-আন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই আন্দোলনে নেতা নির্ম্মল মুণ্ডা যে কর্ম্মক্ষমতা ও সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা বিস্ময়কর।

আগষ্ট আন্দোলন ও আদিবাসী

যে দামিন কো এলাকায় একদা সাঁওতালরা ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেছিল সেই অঞ্চলেই ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময় সাঁওতাল এবং পাহাড়িয়ারা প্রফুল্লচন্দ্র পট্টনায়কের নেতৃত্বে যেরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করেছে সে কাহিনীও মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

দামিন এলাকায় প্রত্যেক তিন মাইল পর পর একটি করে বাংলো আছে। এই বাংলোগুলি একাধারে থানা কাছারি এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের আস্তানা। পট্টনায়কের নেতৃত্বে

তাঁর ডুঙ্গরপুর রাজ্যের ইতিহাসে* বলেছেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ আর বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়ার দিকে গোবিন্দ গুরু নামক জনৈক সাধুর নেতৃত্বে 'ভীল-স্বধার' আন্দোলন স্বরু হয়। গোবিন্দ গুরু স্বজাতীয়দের ধর্ম্মীয় এবং সমাজ-সংস্কারমূলক কার্য্যপ্রণালীর পন্থা নির্দ্দেশ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় যখন জাতির মধ্যে জাগরণের সূচনা দেখা দিলে তখন কর্ত্তৃপক্ষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং এই আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে তাঁরা হলেন কৃতসঙ্কল্প।

কিছুকাল পরে একদিন মানগড়ের মহাড়ী নামক স্থানে প্রায় সমগ্র বাগড় (ডুঙ্গরপুর, বাঁশবাড়া আর দক্ষিণ মেবাড়) অঞ্চলের বহুসংখ্যক ভীল কোনো উৎসব উপলক্ষে জমায়েৎ হলে, উপরোক্ত তিনটি স্থানের পল্টনের সৈন্য আমদানী করে তাদের উপর নির্ব্বিচারে গুলি চালানো হ'ল। এই গুলিচালনার ফলে প্রায় আট শ' লোক মারা গেল, বহু লোক হ'ল আহত। এই প্রকার নৃশংস আচরণ দ্বারা শাসক-সম্প্রদায় সাময়িক ভাবে ভীলদের আন্দোলনের গতিরোধ করতে সক্ষম হলেন।

১৮৯৪ সনে ডুঙ্গরপুরের শাসনভার ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক রিজেন্সী কাউন্সিলের উপর অর্পণ করা হয়। অতঃপর এই রাজ্যের শাসন-ব্যাপারে এক নব বিধান প্রবর্ত্তিত হ'ল। এই 'নয়া কানুন' অনুসারে ভীলজাতি এক শ্রেণীর

---

* "ডুঙ্গরপুর" :—এক সিংহাবলোকন

'জরায়মপেশা কৌম' (অপরাধপ্রবণ জাতি—Criminal tribe) বলে গণ্য হয়।

প্রস্তরখণ্ডসমূহের বাধা অতিক্রম করে গিরিনির্ঝরিণীর প্রবাহ যেমন সময় সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তেমনি মাঝে মাঝে সরকারী বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে ভীল আন্দোলন প্রচণ্ড ভাবে আত্মপ্রকাশ করত, সঙ্গে সঙ্গে সরকার কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করে সে আন্দোলনের গতিকে প্রতিরুদ্ধ করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠতেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের এক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ব্রিটিশ সরকার ভীলদের উপর পুরোদমে দমননীতি চালিয়েছিলেন। তাঁরা বারবার বহু ভীলকে গ্রেফ্তার করেছেন, ভীল জননেতাদের নির্ব্বাসিত করেছেন, কোনো কোনো জায়গায় জনতার উপর বিনা নোটিশে করা হয়েছে লাঠি চার্জ্জ, ফলে শত শত লোক আহত হয়েছে। ভীল ভাষায় প্রকাশিত প্রচারপত্র, পুস্তিকা, ভাষণ এবং বক্তৃতাদির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে—১৪৪ ধারা প্রয়োগ করে প্রভাতফেরী হয়েছে নিষিদ্ধ, কোনো কোনো অঞ্চলে সান্ধ্য আইন জারী হয়েছে, পুলিসের হস্তে ভীল মহিলারা পর্য্যন্ত অপমানিত হয়েছেন। কিন্তু এত লাঞ্ছনা অপমান এবং নির্যাতন সত্ত্বেও ভীলজাতি নিজেদের আদর্শে রয়েছে অবিচলিত, তাদের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে দমন করা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি।

সাঁওতালরা এই বাংলোগুলি দখল করে এবং সেগুলিতে কংগ্রেসী শাসন চালু হয়। তারপর এরা সরকার কর্ত্তৃক সংরক্ষিত জঙ্গলের গাছপালা নির্ম্মূল করে সেখানে চাষ-আবাদ আরম্ভ করে দেয়।

এই আন্দোলন চালানোর সময় টাকার অভাব দেখা দিলে সাঁওতাল কর্ম্মীরা নেতাদের বলেছিল—"বাবু, আমাদের খাওয়া-পরা নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না। দেশের জন্যে দরকার হলে আমরা ঘাস-পাতা খেয়ে লড়াই করব।" আগষ্ট আন্দোলনে সাঁওতাল মেয়েরা পর্য্যন্ত পিছিয়ে থাকেনি। ২১শে আগষ্ট মেয়েদের এক সভা হয়। তাতে তারা এক পয়সা, এক আনা যার যা সাধ্য চাঁদা দেয়, এবং এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করে যে, প্রত্যেক পরিবার থেকে একজন পুরুষকে তারা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্যে উৎসর্গ করবে। প্রথম দফায় দেড়শত জন সত্যাগ্রহী নির্ব্বাচিত হয়।

২৩শে আগষ্ট দামিন কো অঞ্চলে, বিপ্লবের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ২৩শে থেকে ২৭শে এই কয়দিন সাঁওতালরা ধ্বংসাত্মক কার্য্য চালাতে থাকে—তারা ফরেষ্ট আফিস আর বাংলোগুলি জ্বালিয়ে দেয়, মদের দোকান বিধ্বস্ত করে ফেলে। রাস্তার উপর গাছ ফেলে দিয়ে তারা লোকজন ও যানবাহনাদি চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয়। ২৭শে আগষ্ট তারিখে রক্‌সি গ্রামের জঙ্গলে পুলিসের লোকেরা সংগ্রামীদের আক্রমণ করে নির্ম্মমভাবে প্রহার দিতে থাকে। দুর্গা টুডু নামক একজন আদিবাসী আক্রমণের কিছুক্ষণ পরেই মারা যায়

কয়েকজন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়, নেতাদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়।

আন্দোলন যখন মন্দীভূত হল তখন দুমকা ও পাকুড় মহকুমায় হল সশস্ত্র পুলিশের আগমন। তারা বেপরোয়া লুঠতরাজ অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি দ্বারা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করলে।

পলাসী নামক পাহাড়িয়া অঞ্চলের সাঁওতাল বিপ্লবীরা একদিন যখন ভাত রান্না করছিল তখন হঠাৎ সৈন্যদল এসে বেমালুম আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণের ফলে অকুস্থলেই মুডম টুডু, কুশ পাহাড়ী প্রভৃতি সাঁওতাল মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সাঁওতাল শহীদের রক্তে রঞ্জিত সেই পলাসীর প্রান্তর ভারতের মুক্তি-সাধনার অন্যতম প্রধান পীঠস্থানের মর্য্যাদালাভ করেছে।

আগষ্ট আন্দোলনের সময় সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরাই শুধু নয়, বাংলাদেশের ও আসামের আদিবাসীরাও নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকে নি—দেশের ডাকে তখন তারাও মেতে উঠেছিল মরণের নেশায়। কত আদিবাসী বীর শহীদ সেদিন বিপ্লবের আগুনে আত্মবলি দিয়েছে, আমরা তার খবর রাখি না। মানভূম জেলার ঝালদা মহকুমায়, হাজারীবাগ জেলায়, দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে যে বীরত্ব ও নির্ভীকতার পরিচয় সেদিন তারা দিয়েছে তা বাস্তবিকই অতুলনীয়। আসামের মিরি জাতির নেতা কমলা মিরি আগষ্ট আন্দোলনের সময় যে ভাবে হাসতে হাসতে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে তা আমাদের বীর শহীদ কানাই-

[২]

এই স্বাধীনতাপ্রিয় ভীলজাতির মধ্যে বর্ত্তমান যুগে এমন একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যাঁর আদর্শনিষ্ঠার তুলনা নেই। তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিকদের সঙ্গে এক পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য—নাম তাঁর মোতীলাল তেজাবৎ।

১৯৪৬ সম্বতের জ্যৈষ্ঠ মাসে মেবারের তৎকালীন মগরা জেলায় এক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ভীল-পরিবারে মোতীলালের জন্ম হয়। ইনি মোটামুটি একরকম লেখাপড়া শিক্ষা করেন এবং হিন্দী ভাষায় মামুলি জ্ঞান অর্জ্জন করেন। কিন্তু নিজের অন্তর থেকে ইনি যে শিক্ষালাভ করেন. পুঁথিগত বিদ্যা তার কাছে তুচ্ছ। অল্প বয়স থেকেই তিনি দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেখেন—দেশপ্রেম এবং মানবতার আদর্শে তাঁর হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। জায়গীরদারেরা সকলেই থাকেন ব্যক্তিগত স্বার্থ নিয়ে মগ্ন, কিন্তু মোতীলালের বেলায় এর ব্যতিক্রম দেখা গেল। প্রজাদের উপর অন্যান্য জায়গীরদার, তথা সরকারী কর্ম্মচারীদের জুলুমজবরদস্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয়-লাভ করে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল—কি ভাবে দুর্গত প্রজাদের দুঃখমোচন করা যায় তাই হ'ল তাঁর একমাত্র ভাবনা। ১৯২১ সালে তিনি প্রথম ভীল আন্দোলনের 'বীড়া উঠালেন'।*

* আগেকার দিনে পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো অঞ্চলে কোনো দু:সাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে পানের খিলি তুলে নিয়ে মুখে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। একেই বলে বীড়া উঠানো। এর থেকে 'বীড়া উঠানা' কথাটি পশ্চিম ভারতের বহু স্থানে প্রবাদ-বাক্যের মত প্রচলিত হয়ে গেছে।

বিভিন্ন স্থানে মেলা ও উৎসব ইত্যাদির আয়োজন করে বক্তৃতাদি দ্বারা তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে তাদের অপরিসীম অভাব, দৈন্য এবং দুঃখদুর্দ্দশার চিত্র ফুটিয়ে তুললেন। 'মেবার পুকার' নামক দেশাত্মবোধ-উদ্দীপক পুস্তিকা গ্রামে গ্রামে বিতরণ করতে লাগলেন। এই সমস্ত প্রচার-কার্য্যের ফলে অগণিত ভীল নরনারী স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করলে। "মারব না হয় মরব,"—এই আদর্শে তারা হয়ে উঠল অনুপ্রাণিত। এমনি ভাবে ভীলদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দানা বাঁধতে দেখে জায়গীরদার আর সরকারী কর্ম্মচারীরা দস্তুরমত ঘাবড়ে গেলেন এবং বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন। সিরোহী, মেবার আর দাঁতা এই তিনটি অঞ্চলের কোনো কোনো গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। ১৯২২ সালের ৮ই মার্চ্চ ইডরে বহুসংখ্যক ভীল শহীদ হ'ল।

এই আন্দোলন যখন পুরোদমে চলছে তখন মহাত্মা গান্ধীর তরফ থেকে শ্রীমণিলালজী কোঠারী সিরোহীতে গমন করলেন। মণিলালজীর মধ্যস্থতায় ভীল-নেতা তেজাবৎ আর ব্রিটিশ অফিসার হ্যালিডের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয়ে একটা আপোষ-রফার ব্যবস্থা হ'ল। হ্যালিডে ভীলদের ন্যূনতম দাবি পূরণ করবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় তেজাবৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করতে সম্মত হলেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও ব্রিটিশের চিরাচরিত নীতির ব্যতিক্রম হ'ল না—'রাজপুতানা এজেন্সী' বার বার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে লাগলেন। ফলে ভীলরা

আবার গবর্ণেমেণ্টের উপর বিরূপ হয়ে উঠল ; আবার তারা মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠবার উপক্রম করলে। এবার আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করবার জন্যে সরকার কৃতসঙ্কল্প হলেন। ১৯২২ সালের মে মাসে রোহেরা তহশীলে এক নিরস্ত্র জনতার উপর ইংরেজ কর্ম্মচারীরা পুনরায় গুলিবর্ষণ করলে—ভুলা আর বলোলিয়া নামে দুটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল। এই ঘটনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়ে 'রাজস্থান সেবাসঙ্ঘে'র কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণ করে স্থানীয় লোকেদের নিকট থেকে এ সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লাগলেন। গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রমুখাৎ এবং অন্যান্য সূত্রে তাঁরা নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর সরকারের অমানুষিক অত্যাচারের যে সমস্ত কাহিনী জানতে পারলেন তার তুলনা মেলা ভার। তাঁদের রিপোর্টে প্রকাশিত হ'ল যে, উক্ত দু'টি গ্রামে ৩২৫টি পরিবার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়েছে আর ১৮০০ লোকের প্রাণহানি হয়েছে, ৬৪০টি ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া বা বিনষ্ট করা হয়েছে, ৭০৮৫ মণ খাদ্যসামগ্রী আর ৬০ গাড়ী ঘাস জ্বালানো বা লুঠ করা হয়েছে, নিহত এবং অপহৃত পশুর সংখ্যা ১০৮টি। যে সমস্ত মাল লুণ্ঠন করা বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মূল্য ১০,০০০৲ টাকা।

এই অকথ্য অত্যাচার করেও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ক্ষান্ত হলেন না, ভীলদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমূলে বিনষ্ট করবার জন্যে তাঁরা মোতীলাল তেজাবৎকে সাত বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। মোতীলাল কিন্তু ব্রিটিশের

চোখে ধুলো দিয়ে ফেরার হয়ে যান এবং পাহাড়ের এক নিভৃত স্থানে গুপ্ত ভাবে অবস্থান করতে থাকেন। এদিকে ব্রিটিশ সরকারের গুপ্তচর বিভাগ তাঁকে ধরবার জন্যে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠল। তাঁরা আর এক ব্যক্তিকে মোতীলাল তেজাবৎ মনে করে ধরে নিয়ে এল—ব্রিটিশের ন্যায় বিচারে সে বেচারার হ'ল প্রাণদণ্ড। যাতে ভীলদের মধ্যে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তাদের নেতা আর ইহজগতে নেই, সেই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট সেই ব্যক্তির ছিন্ন মুণ্ড বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করতে লাগলেন।

এবার আর লুকিয়ে থাকা তেজাবতের নিকট সমীচীন বলে মনে হ'ল না—জাতিকে আশ্বস্ত করবার জন্যে আত্মপ্রকাশ করা যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করলেন। ১৯২৯ সালের ৩রা জুন তিনি স্বেচ্ছায় ইডর রিয়াসতের খেডব্রহ্ম নামক স্থানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট ধরা দিলেন। বিচারে তাঁকে সাত বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল। উদয়পুর সেণ্ট্র্যাল জেলে নির্দ্দিষ্ট কাল কারাদণ্ড ভোগ করবার পর ১৯৩৬ সালের ১৫ই এপ্রিল মোতীলাল কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন। দীর্ঘ কারাবাসের ফলে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছিল, কিন্তু তা' সত্ত্বেও তিনি নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে রইলেন না। ভীলজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনকে তিনি জীবনের ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। দিনকতক বিশ্রাম করে আবার তিনি নূতন উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। ১৯৩৮ সালে 'মেবার প্রজামণ্ডল' স্থাপিত হওয়ার পর

লালের নির্ভীকভাবে মৃত্যুবরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমাদের আদিবাসী ভায়েরা কতটুকু মূল্য দিয়েছে সে সম্বন্ধে যে আমরা সম্যক্ সচেতন নই সেটা আমাদের পক্ষে গভীর লজ্জার কথা। বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বর থেকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে আদিবাসীদের বীরত্ব এবং আত্মোৎসর্গের কাহিনীসমূহ উদ্ঘাটিত করা আজ তাই একান্ত প্রয়োজন।

অন্ধ্রের কোণ্ডাডোরাদের মুক্তি-সংগ্রাম

কোণ্ডাডোরাদের কথা

পশ্চিমগোদাবরী পূর্ব্বগোদাবরী, এবং ভিজাগাপট্টম (বিশাখাপত্তন) এই তিনটি জেলার প্রায় সাত হাজার বর্গ-মাইল পরিমিত পার্ব্বত্য এবং আরণ্য অঞ্চল নিয়ে মান্দ্রাজ প্রদেশের এজেন্সী অঞ্চল গঠিত। এই অঞ্চলের জনসমষ্টির অধিকাংশই আদিবাসী বা উপজাতীয় লোক। এই সমস্ত উপজাতির সংখ্যা প্রায় ২০টি। ব্রিটিশ আমলে মান্দ্রাজ প্রদেশের এজেন্সী অঞ্চল ছিল আংশিক ভাবে শাসন-সংস্কার-বহির্ভূত অঞ্চল।

এজেন্সী অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা ৪৯৩,০২৬ জন, তন্মধ্যে ৩৩৩,৩৯২ জনই আদিবাসী। এদের মধ্যে কোনো কোনো জাতির লোকেরা গোন্দি উপভাষায় কথা বলে, অপরেরা অনার্য্য মুণ্ডারী ভাষাভাষী। কিন্তু অন্ধ্র প্রদেশের তেলুগুদের সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে মেলামেশার ফলে এদের এক বিপুল জনসমষ্টি তেলুগু ভাষা বুঝতে পারে। ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের দরুন এই

অঞ্চল আজও অনুন্নত অবস্থায় রয়ে গেছে। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে এজেন্সী অঞ্চলের কিয়দংশ প্রথম ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে, বাকী অংশ সুদীর্ঘকাল পরে ১৮৬২ সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলের আদিবাসীরা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি বলে ইংরেজের পক্ষে তাদের উপর নিশ্চিন্ত মনে প্রভুত্ব করা সম্ভবপর হয় নি—বার বার তারা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। এই সমস্ত উপজাতিদের বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে বারকয়েক তাদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে হয়েছে। এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের 'এবরিজন্যাল ট্রাইব ওয়েলফেয়ার এন্‌কোয়ারী কমিটি'র ('আদিম জাতির উন্নয়নবিষয়ক অনুসন্ধান সমিতি') সেক্রেটারী ডক্টর এ. আইয়াপ্পান এম-এ, পি.এইচ.ডি. মাদ্রাজ প্রদেশের আদিবাসীদের সম্বন্ধে লেখা তাঁর পুস্তকে বলেছেন –"The tribes are excitable and their risings known as *Fituris* resulted in several punitive expeditions against them. The last of the *Fiiuris* in which the late Sitarama Razu figured as the leader was a rising against the oppression by unscrupulous officialdom." অর্থাৎ—এই সমস্ত উপজাতীয়েরা উত্তেজনাপ্রবণ এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সীতারাম রাজুর* নেতৃত্বে অন্ধ্রের এজেন্সী অঞ্চলের আদিবাসীদের যে 'ফিটুরি' বা বিদ্রোহ হয় তাই হচ্ছে ব্রিটিশ আমলে তাদের শেষ অভ্যুত্থান।

* অন্ধ্রদেশে ইনি আল্লুড়ি শ্রীরাম রাজা নামেই পরিচিত।

তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন, ফলে পুনরায় তাঁর কারাদণ্ড হয়। যথাসময়ে জেল থেকে তিনি ছাড়া পেলেন বটে, কিন্তু গৃহের নিশ্চিন্ত আরাম বিধাতা এই জননায়কের অদৃষ্টে লেখেন নি। '৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনের সময় ভীলজাতিও যখন "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল তখন তাদের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালেন মোতীলাল। তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল বিপ্লবের উদাত্ত আহ্বান। বেগতিক দেখে সরকার ১৯৪৩ সালের ২৪শে জানুয়ারী পুনরায় তাঁকে উদয়পুর সেণ্ট্রাল জেলে পুরলেন। এবার তাঁর দেড় বৎসরের কারাদণ্ড হ'ল।

জাতির মুক্তি-সাধনায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এই ভীল-নেতার জীবন একটানা দুঃখবরণের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সুদীর্ঘ জীবনের বেশীর ভাগই কেটেছে তাঁর কারা-প্রাচীরের অন্তরালে আর অজ্ঞাতবাসে। বিত্তশালী জায়গীরদার হওয়া সত্ত্বেও প্রথম যৌবনেই তিনি বিপৎসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ পথ বেছে নিয়েছিলেন, তারপর থেকে কণ্টক-মুকুট মাথায় পরে সেই বন্ধুর পথেই তিনি এগিয়ে চলেছেন। চরিত্রবল এবং আত্মত্যাগের দ্বারা স্বজাতীয় নর-নারীর হৃদয়ে তিনি নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ভীল নরনারী তাঁকে কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে তা রাজপুতানার বিখ্যাত লেখক শ্রীঅখিল বিনয়ের উক্তিতে সুপরিস্ফুট। তিনি লিখেছেন: "হমেঁ ফরবরী ১৯৫০ মেঁ আপকে দর্শন করনে কা সৌভাগ্য প্রাপ্ত হুয়া থা। আপ কোটরা ভোপট (উদয়পুর) মেঁ ১২-১৩ ফরবরীকে

আদিবাসী সম্মেলনকে স্বাগতাধ্যক্ষ থে। আপকী বিনম্রতা ঔর সেবাভাব দেখ কর হম মুগ্ধ হো গয়ে। হমনে দেখা কি ভীল পুরুষ ঔর স্ত্রিয়াঁ স্বাভাবিক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সে আপকে চরণ মে প্রণাম করতী থীঁ ; ঔর আপকা আশীর্ব্বাদ পানে কী ইচ্ছুক রহতী থীঁ। ইসসে মালুম হুতা কি ভীল লোগ আপকে দেবতা সমঝতে হৈঁ, ঔর আপকে নাম পর তরহ তরহ কী মনৌতী য়া মন্নত মানতে হৈঁ।"

অর্থাৎ, "১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এঁর দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হয়। উক্ত বৎসরের ১২-১৩ ফেব্রুয়ারী তারিখে ইনি উদয়পুরের কোটরা ভোপটে অনুষ্ঠিত আদিবাসী সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পদে বৃত হন। এঁর বিনম্রতা আর সেবার ভাব দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। আমি দেখলাম যে, ভীল স্ত্রী-পুরুষেরা আন্তরিক প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে তাঁর চরণে প্রণাম নিবেদন করছে—তাঁর আশীর্ব্বাদলাভের জন্যে তাদের কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা ! এসব দেখে শুনে আমার প্রতীতি হ'ল যে, ভীলরা তাঁকে দেবতা বলে মনে করে, তারা সময় সময় তার নামে বিবিধ প্রকারে মানত পর্য্যন্ত করে।"

মোতীলাল তেজাবতের নেতৃত্বে ভীলদের অভ্যুত্থানের কাহিনী রূপকথার মতই চমকপ্রদ। কিন্তু এই গৌরবোজ্জ্বল কাহিনীর সঙ্গে অধিকাংশ শিক্ষিত দেশবাসী যে অপরিচিত সেটা ঘোর লজ্জার কথা। ইংরেজ যখন দেশের মালিক ছিল, তখন তারা আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের বিভেদ সৃষ্টি করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। এই উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বহির্ভূত অঞ্চল

বা আংশিক বহির্ভূত অঞ্চল সৃষ্টি করে তারা সেগুলিতে স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেছে। আদিবাসীদের মুক্তি-আন্দোলনের কথা হয় তারা কৌশলে চেপে রেখেছে নতুবা তার অপব্যাখ্যা করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছে। খাসিয়া-বিদ্রোহের নায়ক তীরত সিংকে তারা চিত্রিত করেছে 'রক্ত-পিপাসু' 'বুনো' 'খুনী' রূপে। নাগারাণী গাইডিলিউকে দিয়েছে 'যাদুকরী' আখ্যা। অন্ধ্রের কোণ্ডা ডোরা বিদ্রোহের নায়ক আল্লুড়ি শ্রীরাম রাজাকে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করেছে।

দেশ আজ স্বাধীন। স্বাধীনতার সত্যিকারের ইতিহাস রচনার পথে যে-সকল বাধা ছিল সেগুলি এখন বহুলাংশে অপসারিত। আজ তাই নূতন করে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন। এই নূতন ইতিহাসে দেশের জন্য আদিবাসীদের দুঃখবরণ ও আত্মবলিদানকে যোগ্য মর্য্যাদা দিতে হবে। একথা ভুললে চলবে না, যে-সকল আদিবাসী নেতা স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করে গেছেন তাঁরাও জাতির বরেণ্য, তাঁদের কীর্ত্তি-কথাও স্মরণীয়।

———



ঠক্কর বাপা

এজেন্সী অঞ্চলের যে সমস্ত আদিবাসী শ্রীরাম রাজার নেতৃত্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল তারা কোণ্ডা ডোরা নামে পরিচিত।

বিশাখাপত্তন জেলার এজেন্সী অঞ্চলের ঢালু জায়গাগুলি এবং তৎসংলগ্ন সমতল অঞ্চলে কোণ্ডা ডোরা বা কোণ্ডা কাপুদের বাস। এদের অধ্যুষিত অঞ্চল কয়েকটি 'মুট্টায়'বিভক্ত। এদের লোকসংখ্যা কয়েক হাজার। গঙ্গারাজু ও মন্থগোল মুট্টার বাসিন্দা কোণ্ডা ডোরাদের লোকসংখ্যা এক হাজার।

কোণ্ডা ডোরারা দুটি শাখায় বিভক্ত (১) পেড্ডা কোণ্ডালু, আর (২) চিন্না কোণ্ডালু। প্রথমোক্তরা কতকটা স্বাধীনভাবে পাহাড়ে বাস করে, তাদের সমাজে আদিম রীতিনীতিও বজায় আছে। শেষোক্তরা বাস করে সমতল ভূমিতে তালপাতায় ছাওয়া কুঁড়ে ঘরে; এরা তেলুগুদের প্রাধান্য মেনে নিয়েছে এবং তাদের রীতিনীতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

পেড্ডা কোণ্ডালুদের মধ্যে যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত তার নাম 'এড়ুরু মেনারিকাম' অর্থাৎ পিসতুত বোনের সহিত বিবাহ। চিন্না কোণ্ডালুদের বিবাহ-প্রথা কিন্তু তেলুগুদের অনুরূপ। এরা সাধারণতঃ মামাতো বোন্‌কে বিয়ে করে। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অবশ্য অন্তর্বিবাহ প্রচলিত।

আজকাল কোণ্ডা ডোরারা সকলেই তেলুগু ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে—তাদের নিজস্ব আদিম ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কোনো কোনো পণ্ডিত অনুমান করেন

যে, এদের মূল ভাষা খন্দ ভাষার সগোত্র। কোণ্ডা ডোরারা গোমাংস ভক্ষণ করে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা হিন্দু বলে আত্মপরিচয় দেয়। হিন্দুধর্ম্ম যে এদের সমাজ-জীবনে কতটা প্রভাব রিস্তার করেছে এটা তারই প্রমাণ।

চিন্না কোণ্ডালুরা যখন বাগাতা নামক আদিবাসী ভূস্বামীদের অধীনে চাষবাসের কাজ করে তখন তারা আন্না অথবা আইয়া এই পদবী গ্রহণ করে, আর যখন তারা স্বাধীনভাবে কৃষিকর্ম্ম করে তখন শুধু ডোরা বলে নিজেদের পরিচয় দেয়।

শ্রীরাম রাজা ছিলেন ধর্ম্মে হিন্দু, জাতিতে তেলুগু। কিন্তু তিনি কোণ্ডা ডোরাদের সঙ্গে হয়ে গিয়েছিলেন একাত্ম। সরকারী কর্ম্মচারীদের উৎপীড়নের হাত থেকে আদিবাসীদের রক্ষণ এবং তাদেরই সহায়তায় ভারত-মাতার মুক্তিসাধন এই ত্ন'টিকেই তিনি জীনের ব্রত বলে বরণ করে নিয়েছিলেন—কোণ্ডা ডোরারাও তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীরা তাদের জাতীয় নেতাদের অধীনে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু তথাকথিত সভ্য ভারতের কোনো নেতার অধিনায়কত্বে আদিবাসীদের মুক্তি-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়ায় দৃষ্টান্ত ব্রিটিশশাসিত ভারতের ইতিহাসে এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয়টি নেই। সেইজন্যেই আমাদের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে কোণ্ডা ডোরা বিদ্রোহের বিশেষ গুরুত্ব আছে। পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহেরু বলেছিলেন যে, মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে শ্রীরামরাজা বাস্তবিকই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে কাঁপিয়ে তুলেছিলেন।

শ্রীরামরাজা ও কোণ্ডা ডোরা-বিদ্রোহ

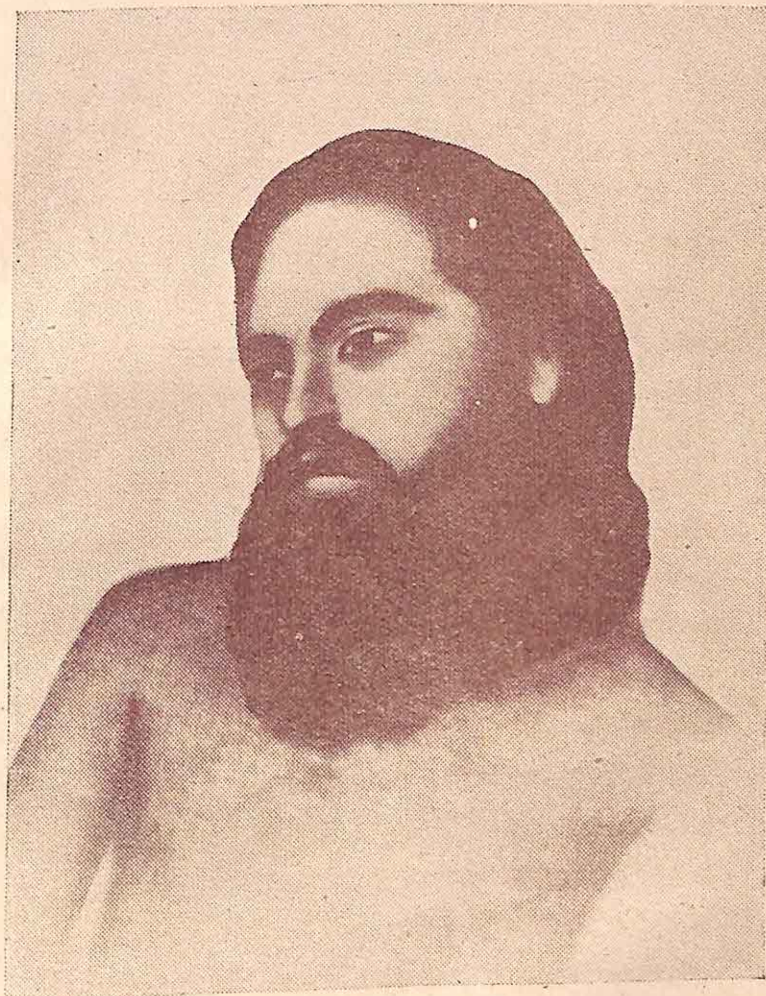
(১)

বিশাখাপত্তন জেলার পান্ড্রাঙ্গি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়-পরিবারে ১৮৯৭ সালের ৫ই জুলাই শ্রীরামরাজার জন্ম হয়। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়ের পড়ায় বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু লেখাপড়ার প্রতি অত্যন্ত ঝোঁক থাকায় ঘরে বসে নিজের চেষ্টায় তিনি বিদ্যাচর্চ্চা করতে থাকেন এবং অনন্যসাধারণ মেধা, প্রতিভা ও ধীশক্তিবলে অল্পকালমধ্যেই তেলুগু, সংস্কৃত এবং হিন্দী এই তিনটি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হয়ে উঠেন। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রীতিমত শরীরচর্চ্চাও করতেন। নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা তিনি ধনুর্ব্বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্যলাভ করেন।

জীবন-প্রভাতেই শ্রীরামরাজা ইংরেজের কবল থেকে ভারত উদ্ধারের স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছিলেন। এই স্বপ্নদর্শী কিশোরের মনে দেশপ্রীতির পাশাপাশি ছিল ধর্ম্মজীবনের জন্য একটি প্রগাঢ় ব্যাকুলতা।

যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। শেষে একদিন কাউকে কিছু না বলে তিনি ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন তিনি ব্রহ্মকাপস্‌লাম নামক স্থানে।

সেখানে নিভৃত নির্জনতায় দিনকতক কাটিয়ে শ্রীরামরাজা ঘরে ফিরে এলেন বটে, কিন্তু তখন তিনি যেন সম্পূর্ণ আলাদা



শ্রীরামরাজা

মানুষে পরিণত হয়েছেন। সেই কর্ম্ম-চাঞ্চল্য আর নেই। প্রচণ্ড বেগের হয়েছে অবসান—একটা সুগভীর বৈরাগ্য যেন তাঁর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ব্রহ্মাকাপস্‌লামের ছায়াঘন অরণ্যে তিনি কোন্ দুর্ল্লভ বস্তুর সন্ধান পেয়েছিলেন কে জানে?

আত্মীয়স্বজন তাঁর ভাবান্তর দেখে তাঁর বিয়ের জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু ব্যর্থ হল তাদের সকল চেষ্টা—সংসারের প্রতি তিলমাত্র আকর্ষণও আর শ্রীরামরাজার নেই। আত্মীয়স্বজনকে হতাশ করে একদিন তিনি গৃহত্যাগ করলেন এবং বিশাখাপত্তন জেলার কৃষ্ণদেবুপেটা পাহাড়ে পৌঁছে এক নিভৃত স্থানে কুটীর নির্ম্মাণ করে কঠোর তপশ্চর্য্যায় রত হলেন। দেশের মুক্তির জন্যে একদিন যিনি ছিলেন ব্যাকুল, এই পাহাড়ে এসে তিনি নিজের মুক্তি-সাধনায় ব্যাপৃত রইলেন। মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্বন্ধ রইল না—এমনিভাবে কাটতে লাগল মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর।

[২]

কৃষ্ণদেবুপেটা পাহাড়ে কোণ্ডা ডোরাদের বাস। একে তাদের দুঃখদারিদ্র্যের পরিসীমা নেই, তার উপর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মুট্টাদারী প্রথা প্রবর্ত্তন করে তাদের দুঃখের বোঝাকে একেবারে দুর্ব্বহ করে তুলেছিলেন। দশ থেকে বিশটি গ্রাম নিয়ে এক একটি মুট্টা। এক একটি এলাকায় পাহাড়ীদের মধ্য থেকেই এক এক জন মুট্টাদার নির্ব্বাচিত হ'ত এবং 'ভেট্টি' বা বাধ্যতা-মূলক শ্রম আদায় করবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল মুট্টাদারদের।

মুট্টাদারের যখনি প্রয়োজন তখনই যে-কোনো পরিবারের অন্ততঃ একজন করে লোক তার জন্যে দিনমজুর খাটতে বাধ্য ছিল। এই শ্রমের বিনিময়ে মুট্টাদার মজুরকে খেতে দিত, কিন্তু কোনো মজুরি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। মুট্টাদাররা রায়তদের উপর অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করত।*

সর্ব্বোপরি ছিল এই সমস্ত আদিবাসীর উপর সরকারী কর্ম্মচারীদের নির্ম্মম শোষণ আর নিষ্ঠুর নিপীড়ন। ফরেষ্ট এবং রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীরাও তাদের নিকট থেকে ভেট্টি আদায় করত, এমন কি সময় সময় তারা পুলিশের জন্য পর্য্যন্ত বিনা মজুরিতে খাটতে বাধ্য হ'ত। তহশীলদার থেকে আরম্ভ করে সকল শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীদর দ্বারাই পাহাড়ীরা নির্য্যাতিত হ'ত।

১৯১৯ সালের শেষ ভাগ—এই সময় কোণ্ডা ডোরাদের বস্তিতে বিষ্টিন নামে এক তহশীলদার প্রভুর আবির্ভাব হল। ইনি এসেই সুরু করে দিলেন বেজায় হম্বিতম্বি। এমন অত্যাচারী সরকারী কর্ম্মচারীর পাল্লায় পাহাড়ীরা আর কখনো পড়ে নি।

---

* এই মুট্টাদারী প্রথা এখনো আছে। এ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল শ্রীঅমরাইয়া চেট্টি বলেন—"রায়তদের উপর মুট্টাদারদের দুর্ব্ব্যবহারের কথা প্রায়ই শোনা যায়। গাঁয়ের লোকেদের বিয়ের সময় মুট্টাদাররা তাদের নিকট থেকে 'কাট নাম' বা পার্ব্বণী আদায় করে থাকে। এই 'কাট নাম' পাঁচ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত হয়। মুট্টাদাররা রায়তদের বিনা মজুরিতে জমি চষতে বাধ্য করে। স্ত্রীলোকদের দিয়ে মাল বহন করায়, কিন্তু তাদের কোন মজুরি দেয় না। কি স্ত্রী, কি পুরুষ

খাটুনির চোটে বেচারীদের প্রাণান্ত হবার যোগাড়। অবশেষে তারা যখন মজুরির কথা তুললে তখন তাদের দাবি পূরণ করা তো দূরের কথা, বিষ্টিন তাদের হাত-পা বেঁধে নাকে-মুখে-চোখে লঙ্কার গুঁড়ো গুঁজে দিতে লাগল।

পাহাড়ীদের উপর তহশীলদারের এই অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী পাহাড়ের নিভৃততম স্থানে তপস্যারত শ্রীরামরাজার কানে গিয়ে পৌঁছল। আর্ত্ত মানবতার করুণ ক্রন্দনে এবার তাপসের ধ্যানভঙ্গ হল—চার পাশে মানুষের দুঃখ হয়ে উঠেছে অভ্রভেদী, এই সময় নিজের মুক্তিসাধনা নিয়ে ব্যাপৃত থাকা তাঁর মনে হল ঘোর স্বার্থপরতা। উৎপীড়নের হাত থেকে

প্রত্যেক রায়তই বছরে সাত দিন থেকে দশ দিন পর্য্যন্ত মুট্টাদারের জন্য জন খাটতে বাধ্য। বিনিময়ে তাদের খেতে দেওয়া হয় মাত্র—মজুরি দেওয়া হয় না। মুট্টাদার বহু স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করতে পারে—বহুবিবাহ তার সামাজিক মর্য্যাদার দ্যোতক। অধিকাংশ মুট্টাদারেরই চার পাঁচটি করে স্ত্রী থাকে। কেউ কেউ সাতটী স্ত্রী পর্য্যন্ত গ্রহণ করে।

সমতলবাসীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অন্ধ্র প্রদেশের কোনো কোনো আদিবাসী সম্মেলনের অধিবেশন এই মুট্টা-প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে—বলা হয়েছে যে, এই প্রথার বিলুপ্তি না হলে আদিবাসীদের প্রকৃত কল্যাণের আশা সুদূরপরাহত। কোনো কোনো নৃতত্ত্ববিদ্ কিন্তু এই প্রথার একেবারে বিলোপসাধন না করে এর সংস্কারের পক্ষপাতী।

—Report on the Aboriginal Tribes of the Province of Madras.

by Dr. A. Aiyappan M.A.Ph.D.

পাহাড়ীদের রক্ষা করবার জন্যে তিনি হয়ে উঠলেন বদ্ধপরিকর এবং পাহাড়ীদের বস্তিতে এসে তাদের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। তহশীলদারের নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিকার প্রার্থনা করে তিনি সরকারের কাছে একখানি আবেদনপত্র পাঠালেন, কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। আবেদন-নিবেদনের ব্যর্থতা বুঝতে পেয়ে অবশেষে তিনি পাহাড়ীদের আত্মশক্তির উদ্বোধন যাতে হয় সে চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন ১৯২০ সাল শেষ হতে চলেছে, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায় সারা দেশ ভেসে গেছে এবং তার ঢেউ আদিবাসী-অধ্যুষিত এই পার্ব্বত্য অঞ্চলেও এসে প্রবেশ করেছে।

সহসা যেন শ্রীরামরাজার দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। অন্তরে অন্তরে তিনি একটা অপূর্ব্ব প্রেরণা এবং বিপুল কর্ম্মোন্মাদনা অনুভব করলেন; কিশোর বয়সে মাতৃভূমির শৃঙ্খলমোচনের যে স্বপ্ন তিনি দেখতেন, তাই আবার আচ্ছন্ন করল তাঁর কল্পনাকে। তিনি ভেবে দেখ দেখলেন, এই তো সুবর্ণসুযোগ— পাহাড় অঞ্চল থেকে এবার হানতে হবে ব্রিটিশ রাজশক্তিকে প্রচণ্ড আঘাত। সহায় তাঁর কয়েক হাজার পাহাড়ী। তাদের কানে দিলেন তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার অমোঘ মন্ত্র। তাঁর আহ্বানে দলে দলে পাহাড়ীরা এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হতে লাগল। তিনি তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে তৈরি করে নিতে লাগলেন। গৌতম ডোরা, মাল্লুডোরা, আঙ্গিরাজ্জু, ইয়েণ্ডু ডোরা প্রভৃতি পাহাড়ীরা হল এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় তাঁর প্রধান সহকর্ম্মী।

সমতলের অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি পাহাড়িয়া অঞ্চলে চলল বৈপ্লবিক আন্দোলন। এক বৎসরে পরে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন, কিন্তু ঝুঞ্চদেবুপেটা পাহাড়ে তখন বিদ্রোহের অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। ১৯২২-এর আগষ্ট থেকে অক্টোবর—এই তিন মাসের মধ্যে শ্রীরামরাজার নেতৃত্বে পাহাড়ীরা কতকগুলি থানা আক্রমণ করে দখল করলে, একটি প্রকাশ্য সংগ্রামে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ স্কট এবং হেইটারসন পাহাড়ীদের হাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেন। ১৯২২ থেকে '২৪ এই দুই বৎসর নীরুখাজরাটানম এজেন্সীর একশত বর্গমাইল পরিমিত স্থান প্রকৃতপক্ষে রামরাজা এবং তাঁর অনুচরদের কর্ত্তৃত্বাধীনেই ছিল।

শ্রীরামরাজা ধীরে ধীরে তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে লাগলেন। সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশের কবল থেকে মুক্ত করবার স্বপ্ন তাঁকে আকুল করে তুলল। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিরাট ও ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে কাজ সুরু করলেন, ভদ্রাচলের নিকটে তিনি একটি আগ্নেয়াস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানা স্থাপনেরও আয়োজন করেছিলেন। উড়িষ্যার কারাপুট অধিকার এবং উড়িষ্যা ও অন্ধ্রদেশে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পাশাপাশি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। কিন্তু ব্রিটিশের কূটকৌশলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর যাবতীয় পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যায়।

আত্মশক্তিতে শ্রীরামরাজার ছিল প্রবল বিশ্বাস। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কোকনদ কংগ্রেসের সময় তিনি আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে এক

পত্রযোগে জানান যে, কয়েক হাজার আগ্নেয়াস্ত্র পেলে তিনি নিজেই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবেন।

এদিকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের ক্রম-বর্দ্ধমান শক্তি দেখে গবর্ণমেন্ট রীতিমত প্রমাদ গণলেন এবং সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে তা' দমন করতে হলেন বদ্ধপরিকর। দলে দলে পুলিশ এবং সৈন্যবাহিনী পাহাড়ে প্রেরিত হতে লাগল। তারা গ্রামগুলি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়, রাস্তায় ঘাটে যেখানে পায় নিরীহ পাহাড়ীদের নির্বিচারে গুলী করে হত্যা করে—এমন কি, অসহায় স্ত্রীলোক এবং শিশুরা পর্য্যন্ত তাদের অকথ্য অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেলে না।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টর গুপ্তচর বিভাগ শ্রীরামরাজাকে ধরবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল, এ নিমিত্ত সরকার পক্ষ থেকে মোটা টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হল। কিন্তু সকলের চোখে ধূলো দিয়ে পাহাড়ের নিভৃতম অঞ্চলে শ্রীরামরাজা এমনভাবে লুকিয়ে করে রইলেন যে, পুলিশ তাকে ধরতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল।

১৯২৪-এর শেষভাগে ভেতুরুমুণ্ডিতে সরকারী সৈন্যবাহিনীর সহিত পাহাড়ীদের বাধল তুমুল সঙ্ঘর্ষ। এই যুদ্ধে শ্রীরামরাজার অনুচরদের হল চূড়ান্ত পরাজয়। যে গৌতম ডোরা ছিলেন তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ তিনি সংগ্রামে প্রাণ হারালেন, মাল্লু ডোরা এবং আঙ্গিরাজু হলেন ব্রিটিশের হাতে বন্দী। এতে শ্রীরামরাজার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল এবং এই সঙ্ঘর্ষের পর পাহাড়ীদের উপর ব্রিটিশ সৈন্যদের অত্যাচার

যখন সীমা অতিক্রম করল তখন তিনি আর সহ্য করতে না পেরে ব্রিটিশের কাছ আত্মসমর্পণ করলেন।

দেশেকে ভালোবাসার অপরাধে শ্রীরামরাজা হয়তো ছিলেন অপরাধী, কিন্তু ব্রিটিশের আদালতে তাঁর সে অপরাধেরও (?) বিচার হল না—হাজতে বন্দী করে ব্রিটিশ অফিসার তাঁকে গুলী করে হত্যা করলেন। এমনিভাবে অন্ধকার বন্দীশালায় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বর্ব্বরোচিত আচরণের ফলে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধকের অমূল্য জীবনের অকালে হল শোচনীয় অবসান—বাইরে সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত হল যে, এই সাংঘাতিক লোকটি যখন হাজত থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন গুলীবর্ষণের ফলে তার প্রাণবিয়োগ হয়েছে।

অন্ধ্রের এজেন্সী অঞ্চলের অরণ্য-পর্ব্বতে আল্লুড়ি শ্রীরামরাজার নেতৃত্বে পরিচালিত আদিবাসীদের সশস্ত্র বিদ্রোহের কাহিনী ভারতের মুক্তি-সাধনার ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কৃষ্ণদেবুপেটার পার্ব্বত্যভূমিতে রক্তের অক্ষরে নূতন হলদিঘাট রচনা করে সেখানকার আদিবাসীরা তাদের নেতার প্রতি আনুগত্য এবং স্বাধীনতা-প্রীতির যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তা যুগে যুগে স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকদের নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে তুলবে।

ভীলজাতির মুক্তিসাধক
মোতীলাল তেজাবৎ

ভীলরা ভারতের এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন জাতি। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদিতে এই আদিম জাতির কথা পাওয়া যায়। কথিত আছে, দ্রোণাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তির সমক্ষে যিনি ধনুর্ব্বিদ্যা অভ্যাস করতেন সেই একলব্য ছিলেন ভীলজাতীয়। গুরুকে দক্ষিণাস্বরূপ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠদানের কাহিনী ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

ভীলদের বীরত্ব সাহস ও দেশপ্রেম অতুলনীয়। পৌরাণিক যুগ থেকে আরম্ভ করে রাজপুত রাণাদের আমল পর্য্যন্ত এদের বহু বীরত্ব-কাহিনীর সহিত আমরা পরিচিত আছি।

স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে রাণা প্রতাপ যেদিন মুষ্টিমেয় সৈন্যদল নিয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বর আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেদিন রাজপুতানার আদিবাসী ভীলরা এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল—রাণার চরম দুর্দ্দিনেও তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে নি। সেদিন এই আদিম জাতির লোকেরা যে বীরত্ব, ত্যাগ, স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়েছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা স্বর্ণাক্ষরে জাজ্বল্যমান থাকবে।

রাণা প্রতাপের সঙ্গে ভীলদের সম্পর্কের কথাই শুধু শিক্ষিত সাধারণের জানা আছে। কিন্তু রাজপুত জাতির রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভকাল থেকে ভীলরা কত ভাবে যে তাঁদের সহযোগিতা



ভীলনেতা মোতীলাল তেজাবৎ

করেছে তার আর অন্ত নেই। কথিত আছে যে, রাজপুত-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাপা রাবলকে মাত্র তিন বৎসর বয়সের সময় ভীলরা জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে প্রতিপালন করে। পরে যথাসময়ে তারাই তাঁকে সিংহাসনে বসায়। ছেলেবেলায় দেবা আর বালিয়া নামে দু'জন ভীল এঁর রক্ষণাবেক্ষণ করত।

ভীলজাতির কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে এদের স্বাধীনতা-প্রীতির উল্লেখ কিছু কিছু পাওয়া যায়।

এই স্বাধীনতাপ্রিয়তা ভীলদের মধ্যে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়ে আসছে। সেই জন্যেই আধুনিককালে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের আহ্বানে ভীলজাতির চিত্ত সহজেই সাড়া দিয়েছে। গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ভীলরা ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান করে অবর্ণনীয় দুঃখযন্ত্রণা বরণ করে নিয়েছে, দলে দলে পুলিসের গুলিতে প্রাণত্যাগ করেছে। দুঃখের বিষয়, তাদের সেই ত্যাগ, তিতিক্ষা ও বীরত্ব-কাহিনীর সঙ্গে আমরা অনেকেই পরিচিত নই।

ভীলরা ভারতের নানা প্রদেশে ছড়িয়ে আছে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ভীল-সম্প্রদায়ের মধ্যে বীর দেশপ্রেমিকদের আবির্ভাব হয়েছে। তাঁদের সকলের কথা এখানে বলা সম্ভব নয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কেবল রাজস্থানের ভীলদের স্বাধীনতা-আন্দোলনের কথা উল্লেখ করব—তাও অত্যন্ত সংক্ষেপে।

আধুনিক কালে ডুঙ্গরপুরের ভীলদের মধ্যেই সর্ব্বপ্রথম সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সুরু হয়। শ্রীশিবলালজী কোটডিয়া

আদিবাসীদের শ্রেষ্ঠ সেবক ঠক্কর বাপা

প্রায় এক বৎসর হতে চলল ভারতের আদিবাসীদের শ্রেষ্ঠ সেবক এবং 'ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠাতা ঠক্কর বাপা পরলোকগমন করেছেন। এদেশের অনুন্নত সম্প্রদায় এবং আদিবাসীদের সেবায় জীবন উৎসর্গ করে দেশবাসীর সমক্ষে যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেলেন তার তুলনা নেই। ভারতের উপেক্ষিত অবজ্ঞাত আড়াই কোটি আদিবাসীর বেদনা প্রথম ঠক্কর বাপার বুকেই গভীরভাবে বেজেছিল। বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গুজরাটের পাঁচ মহল অঞ্চলে যখন প্রথম তিনি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ভীলদের সংস্পর্শে আসেন তখন দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং অশিক্ষার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন এই আদিম জাতির শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বিচলিত হয়ে পড়েন। তখন থেকেই এই সমস্ত আদিবাসীদের উন্নয়নকেই তিনি জীবনের প্রধান ব্রত বলে বরণ করে নেন। সমগ্র দেশে তখন আদিম জাতিদের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার ফুরসত কারো ছিল না। ঠক্কর বাপাই হলেন এদের উন্নয়ন-কার্য্যে অগ্রণী। তারপর পর্ব্বতপ্রমাণ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেভাবে তিনি দীর্ঘ বত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল একাগ্র নিষ্ঠায় আদিবাসীদের কল্যাণকর্ম্মে নিরত ছিলেন, তার তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। আদিম-জাতিদের সম্পর্কে আদিবাসী কথাটা এখন চালু হয়ে গেছে, কিন্তু কথাটা যে ঠক্কর বাপারই উদ্ভাবিত তা অনেকেরই জানা নেই।

ঠক্কর বাপার পুরা নাম অমৃতলাল ঠক্কর। 'বাপা' তাঁর কৌলিক পদবী নয়, তাঁর প্রতি দেশবাসীর শ্রদ্ধার নিদর্শন। গুজরাটের কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত ভবনগরে ১৮৬৯ সালে তাঁর জন্ম হয়। পুণা এঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে আই, সি, আই ডিগ্রি লাভ করবার পর তিনি কয়েক স্থানে সামান্য বেতনে কাজ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সের সময় মাসিক ৩০০৲ বেতনে একটি চাকরি পেয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। সেখানে তিন বৎসর কাজ করবার পর তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৮৯১ সালে একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি মহামতি গোখলে কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত Servant Of India Society বা ভারত সেবক সমিতির সংস্পর্শে এসে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। ১৯০৭ সালে অমৃতলালের পত্নী-বিয়োগ হয়। পিতামাতার পীড়াপীড়িতে তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। দেড় বৎসর পরে তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীও লোকান্তরিতা হন।

এমনিভাবে আঘাতের পর আঘাত দিয়ে বিধাতা যেন অমৃতলালকে ধীরে ধীরে মহত্তর কর্ত্তব্যের জন্য তৈরি করে নিচ্ছিলেন। ১৯১৩ সালে পিতৃবিয়োগের পর উচ্চ বেতনের চাক্‌রিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি ভারত সেবক সমিতির আজীবন সদস্য হলেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের বোম্বাই শাখার কাজে পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন

চাক্‌রি ছাড়বার পর অমৃতলাল ভ্রাতাদের নিকট যে পত্র লেখেন তা যেমন মর্ম্মস্পর্শী তেমনি মহত্তর ব্রতে দীক্ষিত এক

মহাপ্রাণ কর্ম্মযোগীর উন্নত আদর্শবাদেরও পরিচায়ক। সেই পত্রের উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন—"আমার অন্তর্দ্বন্দ্বের এখন অবসান হয়েছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিচ্ছেদমাত্রেই বেদনাদায়ক, কিন্তু একটা মহান আদর্শের টানেই আমি তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি এবং আশা করি যে তোমাদের আশীর্ব্বাদ থেকে বঞ্চিত হব না।"

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ-সংগ্রামে জয়যুক্ত হয়ে গান্ধীজী ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করলে গোখলের নির্দ্দেশে অমৃতলাল এবং ভারত সেবক সমিতির আরো কয়েকজন সদস্য তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীজীর সহিত অমৃতলালের পরিচয় ক্রমে অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয় এবং গোখলের আদর্শে অনুপ্রাণিত এই কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ অবশেষে গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁর গঠনমূলক কর্ম্মের অন্যতম প্রধান সহযোগী হয়ে দাঁড়ান।

অস্পৃশ্যতা বিদূরণ এবং আদিম জাতির উন্নয়ন এই দুইটিই ছিল ঠক্কর বাপার ধ্যান-জ্ঞান, জীবনের সাধনা। ভারত সেবক সমিতির সদস্যরূপে কয়েক বৎসর কাজ করবার পর পাঁচ মহলের ভীল-অধ্যুষিত অঞ্চলকে তিনি তাঁর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচিত করেন এবং আজ থেকে সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে 'ভীল সেবা মণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করে এই সমস্ত আদিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করবার জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করতে থাকেন। তিনিই প্রথম ভারতবাসী যিনি এই সমস্ত পর্ব্বত-অরণ্যচারী অনগ্রসর অবনত আদিবাসীদের মধ্যে নিজের কর্ম্মক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করেন।

সমগ্র দেশ যখন আদিম জাতিদের সমস্যাসমূহ সম্বন্ধে আদৌ সজাগ ছিল না তখন ঠক্কর বাপা এক নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে এদের জীবন-ধারাকে বুঝবার প্রয়াস পান। আড়াই কোটি আদিবাসী যাতে ভারতের বিপুল জনসমষ্টির সহিত একাত্ম ও নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ভারতীয় সমাজ-জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে যেতে পারে, এইটেই ছিল তাঁহার লক্ষ্য। অস্পৃশ্য, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং আদিবাসীদের সহিত শিক্ষিত ভারতবাসীর, তথা-কথিত উচ্চবর্ণের ভারতবাসীর কৃত্রিম ব্যবধান যাতে ঘুচে যায় সেই উদ্দেশ্যে নিরলস কর্ম্ম-সাধনায় তিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর ন্যায় সফলতা-বিফলতায় অবিচলিত থেকে তিনি ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত জাতিগঠন-মূলক কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ঠক্কর বাপা সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখেছেন—"ঠক্কর বাপা অসাধারণ কার্য্যকর্ত্তা হৈঁ। উনকা কাম হী উন্‌কা একমাত্র সংন্তষ ঔর মনোরঞ্জন হৈঁ। ওয়ে আপনে জীবনকে মিশন মে জো শক্তি লগাতে হৈঁ, উসে দেখ সুনকর আসপাস কে নৌজোয়ান ভী সরমা জাতে হৈঁ।" বাস্তবিকই এই অশীতিপর বৃদ্ধের কর্ম্মক্ষমতা দেখে শুনে নবীন যুবকেরাও নিজেদের কর্ম্মশক্তির ন্যূনতার জন্যে লজ্জা বোধ করত।

নিজের সুদীর্ঘ জীবনে কত ভাবে যে ঠক্কর বাপা ভারতের আদিবাসীদের সেবা করে গেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সভাপতি করে তিনিই 'ভারতীয় আদিম জাতি সেবক সঙ্ঘ' নামক সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন।

ঠক্কর বাপা তাঁর জীবনব্রতের আংশিক সফলতা দেখে-গেছেন। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে সৌরাষ্ট্র ইউনিয়ন থেকে তিনি ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। একথা বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না যে, প্রধানতঃ তাঁরই চেষ্টায় আদিবাসীদের উন্নয়নের দিকে আমাদের জাতীয় সরকারের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল এবং তারই দরুন ভারত-রাষ্ট্রের নূতন সংবিধানে আদিবাসীদের পূর্ণ নাগরিক অধিকারলাভের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।



প্রমাণ-পঞ্জী

সংস্কৃত—

অথর্ব্ব বেদ

কালিকা পুরাণ

ইংরেজী—

The people of India—H. Riseley

A History of Assam—E. A. Gait

The Background of Assamese Culture—

Rajmohan Nath.

Tribes of India—Part I & II

Edited by A. V. Thakkar

(Bharatiya Adim Jati Sevak Sangh's Publication)

Thakkar Bapa

Commemoration Volume—Ed. by T.N. Jagadisan and Shyamlal

Report On The Socio-Ecouomic Conditions Of The Aboriginal Tribes Of The Province Of Madras—

Dr. A. Aiyappan M. A. Ph. D.

Racial Elements In The Population—

Dr. B. S. Guha M.A.Ph.D.

Behind the Madgole Hill—R. M. Sarma

The Angami Nagas—J. H. Hutton

The Lhota Nagas—J. P. Mills

The Rengma Nagas— "

The Ao Nagas— "

The Lushei Kuki clans—J. Shakespeare

The Garos—A. Playfair

The Khasis—Major P. R. T. Gurdon

The Meitheis—T. C. Hudson

Naga tribes of Manipur— "

Tne Sema Nagas—J. H. Huttton

The Kacharis—Rev. S. Endle

The Mikirs—Edward Stack

Folk Tales of the Khasis—Mrs Rafy

" " Kacharis—Rev. S. Endle

Hill Tribes in Assam—Jogen Saikia

Reports, Booklcts Etc.

Report of the Bharatiya Adim Jati Sevak Sangh (October 1948 to October 1949)

Report of the Conference of the Social Workers and Anthropologists for Tribal People in India (held on 24th & 25th October 1948, in Delhi)

"Release Gaidiliu" (Published in June 1939)

বাংলা—

হিন্দু সমাজের গড়ন—শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

শাসনতন্ত্রের আদিম অধিবাসী ও উপজাতির স্থান—

শ্রীকেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন বাংলা পত্র সঙ্কলন—ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

মণিপুরের ইতিহাস—মুকুন্দলাল চৌধুরী

ভারতের আদিবাসী—শ্রীসুবোধ ঘোষ

আসামের অরণ্যচারী—শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

আমাদের অপরিচিত প্রতিবেশী— ”

পাহাড়িয়া কাহিনী— ”

বিচিত্র মণিপুর— ”

হিন্দী

হমারী আদিম জাতিয়াঁ—শ্রীঅখিল বিনয় ও শ্রীভগবানদাস কেলা প্রণীত।

(দারাগঞ্জ, এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত)

অসমীয়া

গৌরবময় অসম—শ্রীরাজমোহন নাথ

ইংরেজী ও বাংলা মাসিক পত্রিকা

Modern Review : April 1945

Teerat Singh And The Khasei Rebellion—

Rebati Mohan Lahiri

Science & Culture, 1949

Aboriginal Population And Their Place In The National Life Of India—Dr. B. S. Guha

প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩২

সাঁওতালী সংস্কার—দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল

প্রবাসী পৌষ ১৩৫১

মণিপুর - শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বৈভাষিক (ইংরেজী ও তেলুগু) পাক্ষিক পত্র

Jugadharma—

Edited by—R. Maudeswar Sarma
